বারাকপুর মহকুমায়
রাষ্ট্রগুরু গান্ধীজি নজরুল

'প্রভা প্রকাশনী'
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা- ১২

প্রকাশ কাল : ১৪ মে, ২০০০

প্রকাশক : অসীম কুমার মণ্ডল; ১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ অলংকরণ : রঘুনন্দন দে (প্রচ্ছদ চিত্রের গান্ধীজির মুখাবয়বের ছবিটি বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় থেকে প্রাপ্ত)

ডিটিপি কম্পোজ : লেজারপ্লাস, শেওড়াফুলি, হুগলি, দূরভাষ : ২৬৩২-৫১৭৯

মুদ্রণ : ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১ গড়পাড় রোড, কলকাতা-৬

সম্পাদকীয়

সাহিত্যসাধক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বহু কৃতী মানুষের স্পর্শে ধন্য বারাকপুর মহকুমা। উত্তরে কাঞ্চনপল্লী (বর্তমান কাঁচড়াপাড়া) থেকে দক্ষিণে বরানগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহকুমা। পশ্চিমে বয়ে চলেছে হুগলি নদী। রাষ্ট্রগুরু, গান্ধীজি ও কাজী নজরুল এঁরা কেউই এই মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে এই মহকুমা। রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে বারাকপুরের যোগসূত্র দীর্ঘদিনের। ১৮৮০ সাল থেকে ৬ অগস্ট ১৯২৫ আমৃত্যু তিনি বারাকপুরে বসবাস করেছেন। শেষ ট্রেন ধরেও তিনি কলকাতা থেকে বারাকপুরের মণিরামপুর অঞ্চলে নিজের বসতবাটিতে আসতেন। গান্ধীজির কাছে সোদপুর ছিল 'দ্বিতীয় আবাসস্থল'। বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন এখান থেকে। নজরুল এই মহকুমায় এসেছেন কখন তরুণদের বিপ্লবী কাজে উৎসাহ দিতে, কখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে, কখনওবা সাহিত্যের আসরে যোগ দিতে।

রাষ্ট্রগুরু, গান্ধীজি আর নজরুল আমাদের জাতীয় চেতনাকে পুষ্ট করেছেন, এ তো সকলেরই জানা। কিন্তু বারাকপুর মহকুমার সঙ্গে তাঁদের যে আত্মীয়তা তা আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। এইসব অজানা তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। কৃশানু ভট্টাচার্য কিছু আলোকচিত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ এই গ্রন্থের লেখকদের কাছেও।

মুখবন্ধ

আজকাল বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা আনন্দের কথা, কারণ দেশের সামগ্রিক ইতিহাসে বহু তথ্য স্থানাভাবে বাদ পড়ে যায়। অথচ আঞ্চলিক ইতিহাসে সেগুলি লিপিবদ্ধ হওয়ায় পাঠকেরা অনেক নতুন কথা জানতে পারেন। এজন্যে জেলা মহকুমা শহর নগর গ্রামভিত্তিক বহু ইতিহাস গ্রন্থের চাহিদা বেড়েছে।

শ্রী কানাইপদ রায় এরমধ্যে বারাকপুর মহকুমাকে নির্ভর করে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ সংকলিত করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এসবের পরিপূরক বর্তমান গ্রন্থ 'বারাকপুর মহকুমায় রাষ্ট্রগুরু গান্ধীজি নজরুল'। ব্যক্তির সঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে। কার্লাইল বলেছেন, '...history is the biography of great men'. মার্কস্-এঙ্গেলস্ মনে করতেন, 'History does nothing, it possesses no immense wealth, fights no battles. It is rather man, real living man who does everything, who possesses and fights'. এইদিক থেকে দেখলে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী ও কাজী নজরুল ইসলামের কার্যকলাপ বারাকপুর মহকুমার আঞ্চলিক ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে।

অবশ্য এডওয়ার্ড হ্যালেট কার্ তাঁর গ্রন্থ ''What is history''তে ইতিহাসে ব্যক্তির গুরুত্বকে অস্বীকার করে লিখেছেন, ''The cult of individualism is one of the most pervasive of modern historical myths''. এই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, বারাকপুর মহকুমার সঙ্গে ভারতের তিন মহান ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা লিপিবদ্ধ করে বর্তমান গ্রন্থটি পাঠকের মনোরঞ্জন করবে।

এই গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধ গবেষণানির্ভর, লেখকেরাও খ্যাতিমান, অজস্র নতুন তথ্যও গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আমি শ্রী কানাইপদ রায়কে এই মূল্যবান গ্রন্থের সংকলনের জন্য অভিনন্দন জানাই।

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ

সুপ্রিয় মুন্সী

মণিরামপুর বর্তমানে বারাকপুর শহরের একটি প্রধান অংশ ও জনপদ, এককালে যার নিজস্ব ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, যার মধ্যে অন্যতম ভারতীয় জাতীয়তার পিতৃপ্রতিম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রী হওয়া, দেশবাসী যাঁকে কৃতজ্ঞ চিত্তে 'রাষ্ট্রগুরু' বলে বরণ করে নিয়েছে। রাষ্ট্রগুরু প্রথম তাঁর কম্বু কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন "মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য ও সেবা সব থেকে উন্নত ধরনের ধর্ম এবং সত্যিকারের ভগবৎ সেবা" এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রাজনৈতিক ও দেশগঠনের আন্দোলন চালিয়েছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের জাতীয় দাবি 'স্বায়ত্তশাসন'-এর কথা তিনিই প্রথম শুনিয়েছিলেন দেশবাসীকে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন'ই ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় কংগ্রেস'-এর পূর্বসূরী। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রখ্যাত স্বদেশপ্রেমী মনীষীগণ এই 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন' বা 'ভারত সভা'র পতাকাতলেই একত্র হয়েছিলেন, তা তাঁরা বঙ্গ বাসীই হন, কি মহারাষ্ট্রবাসীই হন বা তামিলনাড়ুবাসী কি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহারবাসী'ই হন। ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির 'গ্র্যান্ড ওল্ড্‌ম্যান' বা 'দাদামশাই' দাদাভাই নৌরজী লিখেছেন যে সুরেন্দ্রনাথই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীর মধ্যে জাতীয়তার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নবীন ভারত বা স্বদেশের তরুণ সমাজকে দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও দেশের জন্য কাজে ব্রতী করেছিলেন তিনিই। মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন যে একটা সময় ছিল যখন নবীন, তরুণ ভারত তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীর জন্যে অপেক্ষা করত, তিনি যা বলবেন তখনই তা পালন করতে উদ্‌গ্রীব হত। গান্ধীজি ওঁকে 'সেজ্‌ অব বারাকপুর' বা 'বারাকপুরের ঋষি' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯২৫ সালের ৬ মে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে ওঁর মণিরামপুরের বাসভবনে যাওয়াকে 'তীর্থযাত্রা' বলে লিখেছিলেন, রাষ্ট্রগুরুর দেহ অবয়বকে লৌহ সদৃশ বলেছিলেন। সত্যিই সুরেন্দ্রনাথ অমিত শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁর দেহ, মন ও কণ্ঠ সব দিক দিয়েই। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রগুরুর তেজস্বিনী বাগ্মিতার কথাও এসে যায়। তাঁকে ডেমোস্থিনিস্‌, সিসিরো, মিরাবো থেকে পিট্‌, গ্ল্যাড্‌স্টোন্‌, বার্ক, সেরিডন পর্যন্ত মানব ইতিহাসের বিখ্যাত বাগ্মীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

সমসাময়িক বঙ্গদেশে 'সুরেন বাঁড়ুজ্যে' বলে অধিক পরিচিত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর জীবন ও কর্ম এবং চিন্তা ও লেখা যেমন এদেশের একটি বিশেষ কালের রাজনৈতিক ইতিহাস ও জনজাগরণের ইতিহাস, তেমনি তাঁর বক্তৃতাবলি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকা তাঁর সাংবাদিক দিকটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। শিক্ষার বিস্তারে বা শিক্ষকরূপে তাঁর কাজও ঐতিহাসিক ও এই বিষয়ে তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অনেক ছাত্রই বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই বড়মানুষ ও শিক্ষক

হয়েছেন, যাঁর মধ্যে এখনই মনে পড়ছে কিংবদন্তী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নাম। তিনি দক্ষ প্রকাশকও ছিলেন এবং বহুবছর উত্তর বারাকপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতা পুরসভায় কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিলের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম এদেশে স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্রগুরুর জীবন সন তারিখও বিশাল। কেবল কর্মজীবনই ১৮৭১ সাল থেকে ১৯২৫ সালের ৬ অগস্ট, অর্থাৎ ওঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৮৮৪-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ এই পর্যায়ে তিনি বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের 'মুকুটহীন সম্রাট', 'আনক্রাউন্ড্ কিং অফ্ বেঙ্গল'। তেজস্বী, মানবিক ও মনের গুণ এবং নানা দেশ ও দশ হিতৈষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন, কার্যক্রম ও সম্মান জয় করার এক অনন্য প্রায় পঞ্চান্ন বছরের রোমাঞ্চকর বিশাল ইতিহাস। অন্য অবসরে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে প্রথম থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনটি আদর্শ ছিল— (১) স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত করা, (২) হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপন এবং (৩) জনসাধারণের উন্নতি বিধান করে প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপন।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আইনবিদ্ স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষের নবজাগরণ বাংলার নেতৃত্বদানেই সম্ভব হয়েছিল এবং সেই বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্যার সুরেন্দ্রনাথ। আর ভারতের নাইটিঙ্গেল বীরাঙ্গনা সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন— "আমরা তাঁর স্বপ্নের, তাঁর দূরদৃষ্টির সন্তান। আমরা যেন মনে না করি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি থেকে মহাত্মা গান্ধী— স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলনের যে বিবর্তন ও জোয়ার তা কোনও সময়ে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদ কি। ... ... যদি কোনওদিন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে এই দেশগঠনে যে সকল নেতৃবৃন্দের অবদান ছিল তার সঠিক মূল্যায়ন করা, তবে রাষ্ট্রগুরুর স্থান অত্যন্ত উচ্চই হবে ও চিরকাল তা জাতির স্মরণে থাকবে— কেবল রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নয়, একজন সংগঠক, স্থপতি এবং সাংগাঠনিক চিন্তাবিদ হিসাবে।"

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনীষা, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সমগ্র ভারতে আদৃত হয়েছিল এবং তাঁর সমসাময়িক জাতীয় নেতৃবৃন্দ, যাঁদের মধ্যে অবশ্যই দাদাভাই নৌরোজী, স্যার ফিরোজ শা মেহতা, বিধানচন্দ্র পাল, মহামতি গোখলে, প্রমুখ ছিলেন, তাঁকে 'জাতীয়তার জনক' বা 'রাষ্ট্রগুরু' বলে অভিহিত করে জাতিগঠন ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে দেশব্যাপী আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আর একটি মহাগুণ, 'বাগ্মিতা', তাঁকে কেবল এদেশে নয়, ইংলন্ডেও কিংবদন্তী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। যে মহাত্মা গান্ধী একদা তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির 'নেশ্টর' বা 'বিজ্ঞ পরামর্শদাতা' রূপে বর্ণনা করেছিলেন, সেই মহাত্মাই রাষ্ট্রগুরুর মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথের ওজস্বিনী বক্তৃতা তাঁর শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। আর ১৮৯০ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডনে একটি জনসভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইংলন্ডের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'টাইম্স'-এর একটি সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়— "তাঁর বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত মহৎ ও চমৎকার এবং তাঁর অকাট্য যুক্তি, ভাষার মাধুর্য এবং উদ্দীপ্ত বাচনভঙ্গী বিদগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দকে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত শিহরিত করেছিল। সংসদের অভ্যন্তরে

ও বাইরে অভিজ্ঞ বাগ্মী সাংসদরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বক্তৃতার মধ্যে উইলিয়াম্ পিটের বজ্রগম্ভীর স্বরক্ষেপন, ফক্সের যুক্তির মায়াজাল সৃষ্টির দক্ষতা, বাক্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সজীব উদাহরণসমূহ এবং সেরিডনের ক্ষুরধার বুদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন।''

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মধ্যে কি ছিল? প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন— ''কেবল ফাঁকা আওয়াজে কি কিছু গড়িয়া উঠে? একটা সুর চাই, একটা তাল চাই, একটা ধরতা চাই আর সকলের উপরে চাই একটা ভাব। এই সবারই এক ঐকতান 'কথার ভট্টাচার্য' সুরেন্দ্রনাথ।'' সত্য-সত্যই তাঁর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র ওজস্বিতা নয়, তার থেকে অতিরিক্ত কিছু— তাঁর বাগ্মিতার ভেতর দিয়ে উদ্ভাসিত হত তাঁর সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনীষা, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, তদুপরি প্রবল স্বদেশপ্রেম। বস্তুত তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বদেশের কল্যাণের কাজে তাঁর সবকটি মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিকে নিয়োজিত ও কার্যকর করা। সম্ভবত তাঁর বাগ্মিতার অন্যতম শক্তি বা জোর ছিল তাঁর স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অপমান, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা। সঠিক অর্থেই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা কেবল বাক্যের তুবড়ি ছিল না, যুক্তি-তর্কের বিভায় তা ছিল জ্যোতির্ময়। সেইজন্যে তা জলের মত মিলিয়ে যেত না, শ্রোতার চিত্তে একেবারে তা গেঁথে যেত।

এই প্রসঙ্গে ইংলন্ডে অকস্‌ফোর্ড ইউনিয়নে তাঁর বক্তৃতা আমরা স্মরণ করতে পারি— ''বলা হয়ে থাকে যে, ইংরেজরা আসবার আগে ভারতীয়গণ বর্বর ও অসভ্য ছিল। এই সভায় সমবেত ব্যক্তিগণকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমি ভারতীয় বলে গৌরববোধ করি। কারণ এই জাতি এক মহৎ ও সুপ্রাচীন বংশোদ্ভূত। যখন সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিদের পূর্বপুরুষগণ বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ করেছিলেন তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিশাল রাজ্য স্থাপন, সুদৃশ্য নগরী প্রতিষ্ঠা, ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের প্রচার ও এক মহৎভাষা অনুশীলন দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন আজও তা সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করছে। ... আমরা প্রতিনিধিমূলক যে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি দাবি করছি সেই স্বায়ত্তশাসনমূলক রাষ্ট্রবিধি আর্যসভ্যতারই একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল এবং আমরা আর্যসম্ভূত। অতএব আমরা যখন এই প্রকার দাবি করি তখন আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করছি মাত্র। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার। সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতিরই ইহা জন্মগত অধিকার। ...''

সুরেন্দ্রনাথ কিভাবে বক্তৃতা করতেন? তাঁর দেহ ছিল বিশাল ও হাত দুটিও খুব দীর্ঘ ছিল। তখনকার সময়ে সভায় মাইকের ব্যবহার থাকত না। খুব উচ্চস্বরে প্রবল বেগে দুহাত চালিত করে তিনি বক্তৃতা দিতেন। কলকাতা টাউন হলে একবার বক্তৃতার সময়ে স্বয়ং ভাইসরয়কে তিনি অনুরোধ করেছিলেন একটু দূরত্ব রেখে বসার জন্য!

তাঁর বক্তৃতার প্রভাব কিরকম অনুভূত হত! বিজ্ঞানী স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার ('ভারতে শিখ জাতির প্রতিপত্তির অভ্যুত্থান') প্রভাব এইভাবে বর্ণনা করেছেন— ''এমন বক্তৃতা বাঙালি আর কখনো ইতিপূর্বে শুনে নাই। যেমন বিষয়, তেমনই সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদনী ভাষা। সেদিন সন্ধ্যার সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে গোলদীঘির চারিদিকে যেন একটা প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের আলোকসামান্য বাগ্‌বিভূতির আশ্রয়ে গুরুগোবিন্দের সময় থেকে

শিখজাতির জাগরণের ইতিহাস অভিব্যক্ত হইয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলীর অন্তরে এক অদ্ভুত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসকার পট্টভি সীতারামাইয়া লিখেছেন— "...ভারতবর্ষে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত তাঁর কম্বু কণ্ঠ সভ্য জগতের কোণে কোণে পৌঁছে গেছিল। ভাষার ওপরে দক্ষতা, সুরুচিপূর্ণ সঠিক শব্দচয়ন, সমৃদ্ধ রূপক, সর্বোপরি আবেগের সুউচ্চ চূড়ায় শ্রোতৃবৃন্দকে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানবিক প্রবৃত্তিকে জাগরিত করার বিষয়ে তাঁর মতো বক্তৃতা আর কারও পক্ষে প্রদান করা সম্ভব হয়নি, কাছাকাছি যাবার মতো আর কারও কথা স্মরণে আসে না।"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৮৯৫ সালের পূর্ণ অধিবেশন স্মরণীয় হয়ে আছে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত ভাষণের জন্য। প্রায় একশত পৃষ্ঠা ব্যাপী এই ভাষণ সম্বন্ধে 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্র যেমন সুউচ্চ প্রশংসা করেছিল তেমনি মাদ্রাজের (বর্তমানে চেন্নাই) 'হিন্দু' সংবাদপত্র লিখেছিল— "ভারতীয় রাজনীতির ছাত্রমাত্রেরই এই বক্তৃতা মুখস্থ করা উচিত।" আবেগ জাগানো ঐ ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন? প্রথমেই তিনি কংগ্রেসকে সমগ্র জাতির 'বেসরকারি মহাসভা' বলে অভিহিত করলেন এবং সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি হল। এর পরে কংগ্রেস সভাপতির পদের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে, এই পদপ্রাপ্তি খুবই সম্মানের নিশ্চয়ই, কিন্তু এই পদের দায়িত্ব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কংগ্রেস সভাপতি কেবল একজন বক্তা নন, তার থেকে অনেক বেশি। জাতির অন্তরে যে প্রেরণা তার সমগ্র সত্তাকে উজ্জীবিত করে তাকে ভাষা দান করা তাঁর মুখ্য কর্তব্য এবং সেই জন্য জাতির সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁকে সজাগ থাকতে হবে, তাদের বিশ্বাস তাঁকে অর্জন করতে হবে।"

কংগ্রেসের গুরুত্ব বিষয়ে তিনি বললেন— "নবভারতের জাগ্রত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কংগ্রেস এবং এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানই একদিন জাতীয় আশা-আকাঙ্খার মূল লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসনের তোরণতলে আমাদের পৌঁছে দেবে। তবে আমাদের শৃঙ্খলাবোধকে আরও উন্নত করতে হবে, দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। কংগ্রেসকে হিন্দুদের বা অমুক দলের বলে ভাবা অনুচিত হবে। বরং কংগ্রেস হবে সংযুক্ত ভারতবর্ষের, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্শী, শিখ সকল ধর্মাবলম্বীর। এটি একটি সার্বজনীন মঞ্চ— এখানে আমরা সবাই আমাদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় যে সংকীর্ণতা ও বিভেদ রয়েছে তাকে অতিক্রম করে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আমাদের জাতীয় কর্তব্য সমাধা করব। জাতির স্বার্থকে তুলে ধরতে আজ সময় এসেছে সর্বপ্রকার বিরোধকে ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সকলের এগিয়ে যাবার ...।" ২০০০ সালেও ভারত তথা সারা বিশ্বের পক্ষেও এই চেতনা কতখানি প্রযোজ্য তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। সেই সময়ে জাতির কথা বলতেই হয়েছে, আজ তার থেকে উত্তরণ স্বাভাবিক।

সুরেন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি বিখ্যাত বক্তৃতার কথা আমরা আলোচনা করতে পারি এবং কেবল বিষয় বৈচিত্র্য বা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয় নির্বাচন নয়, নতুন ব্যাঞ্জনা বা মাত্রা যোগও এই সব বক্তৃতাকে আরও আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ মহাপ্রভুর জীবনের এক নতুন ব্যাখ্যা দিলেন, ভক্তিতত্ত্বের পরিবর্তে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক এক বৈপ্লবিক

সমাজ সংস্কারের, জাতি-বর্ণের গণ্ডী পেরিয়ে এক নতুন সমাজ-বিধান প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম। শ্রীচৈতন্যের ধর্মের মধ্যে একটি অসাধারণ স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণার কথা সুরেন্দ্রনাথ সকলকে জানালেন। 'শিখ অভ্যুত্থানের ইতিহাস' ও শ্রীচৈতন্যদেব বিষয়ক বক্তৃতা দুটি সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখেছেন —"এই দুটি বক্তৃতা দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ আমাদের নকলনবিশী দেশভক্তিকে বৈদেশিক ইতিহাসের কল্পিত প্রভাব ও প্রেরণা থেকে মুক্ত করে আমাদের নিজেদের ইতিহাসের বাস্তবতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। এ বড় কম কথা নহে।"

সুরেন্দ্রনাথের আরও একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতা প্রখ্যাত ইতালীয় মহাবিপ্লবী ম্যাট্‌সিনি সম্বন্ধে। বিপিনচন্দ্র পাল এই বিষয়ে লিখেছেন—"সুরেন্দ্রনাথের ম্যাট্‌সিনি সম্বন্ধে বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় যোগ দিলাম।"

আর কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিলের বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা তদানীন্তন বাংলা তথা ভারতবর্ষীয় জীবনে গভীর রেখাপাত ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কলকাতা পুরসভার আইন কানুন বিষয়ে বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি একটি বিল রচনা করেন। এই বিলই 'ম্যাকেঞ্জি বিল' বলে পরিচিত। যেদিন এই বিল গৃহীত হয় সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বিলটির বিরোধিতা করে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদানীন্তন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণকে 'সবচেয়ে বাঙ্ময় নিন্দা' বলে অভিহিত করে।

ছাত্র বৎসল, আদর্শ শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথের মাদ্রাজে এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা আজও সমান উপযোগী বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন— "আমি তোমাদের বলব স্বদেশের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে তোমরা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা বিসর্জন দাও এবং চিরকালীন নৈতিক বিধিগুলির ওপর জীবন ধারণ করে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করো। অধুনা আমাদের গৃহে ও শিক্ষায়তনে সংযমের অভাব ও বিশৃঙ্খলার প্রসার দেখা দিয়েছে। আশা করি ইহা চিরস্থায়ী হবে না এবং যে কারণ পরম্পরায় এদের উৎপত্তি তার অবসানে তোমরা সচেষ্ট হবে।"

আর শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি তাঁর আহ্বান পরবর্তী একটি ভাষণে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে— 'শিক্ষক মহাশয়েরা ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক। এর থেকে মহৎ বৃত্তির কথা আমি ভাবতেই পারি না। স্বর্গ থেকে যেন তাঁরা নিয়োগপ্রাপ্ত, এতই পবিত্র তাঁদের কাজ। কিন্তু কতজন আর তাঁদের দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করেন ...!"

বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথকে কি আমরা আবার আহ্বান জানাব আমাদের বর্তমান হতাশাজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার ও পুনর্জাগরণের বার্তা স্বদেশ তথা বিশ্বের দিকে দিকে পৌছে দেবার জন্যে!

লেখক পরিচিতি : কঃ বিঃ, বিদ্যাঃ বিঃ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক অধ্যাপক, গবেষক এবং বর্তমানে বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের নির্দেশক-সম্পাদক।

সুরেন্দ্রনাথ : বারাকপুর থেকে হাইকোর্ট

তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নাম— সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ করবার যে আন্দোলন ও প্রচেষ্টা, তার নেতৃত্ব দিয়ে দেশবাসীর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন 'মুকুটহীন রাজা' হিসাবে। গান্ধীজি তাঁর মৃত্যুতে তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'Lion of Bengal'। দেশবাসীর রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা তিনিই জাগিয়ে তুলেছিলেন যাঁর জন্য তাঁর 'রাষ্ট্রগুরু' উপাধি। তাঁর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ এবং তা পৃথিবীর সর্বকালের খ্যাতনামা বাগ্মীদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর স্বদেশ-প্রেম, স্বদেশ মুক্তির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ, তাঁর সাহসিকতা তাঁকে করে তুলেছিল এক প্রবাদ-পুরুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ এবং অনমনীয় মনোভাবের জন্য দেশবাসী তাঁকে আর এক উপাধি দিয়েছিল— 'সারেন্ডার-নট'।

রাষ্ট্রগুরুর প্রতিভা এবং বিভিন্ন দিকে তাঁর অবদানের কথা অনেকে লিখবেন। আমি এখানে শুধু বলব তিনটি ঘটনা— একবার জীবনের প্রভাতে যখন অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি নিজে গিয়েছিলেন বিলেতের আদালতে, আর পরের দু'বার পরিণত বয়সে, যখন আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁকে আসতে হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে এবং পরে বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে, আর একবার বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

১৮৬৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ বিলেত গেলেন আই.সি.এস. পরীক্ষার জন্য। তখন এই চাকরিতে ভারতীয় বিশেষ কেউ ছিলেন না। খুব পরিশ্রম করে পরীক্ষা দিলেন, এবং সফল পরীক্ষার্থীদের তালিকায় তাঁর নাম বেরুলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এক সমস্যা উঠল বয়স নিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে তাঁর বয়স লেখা ছিল ১৬। সেটা ছিল ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাস। তাহলে আই.সি.এস. পরীক্ষার সময়ে তাঁর বয়স হয় ২১-এর চেয়ে বেশি। আর তখনকার নিয়ম অনুযায়ী আই.সি.এস. পরীক্ষার্থীর বয়ঃসীমা ছিল ২১। কিন্তু তখন তাঁর সত্যিকার বয়স ২১-এর চেয়ে কম। এই বৈষম্যের কারণ ভারতীয় ও ইংরেজি বয়সের হিসাবের বিভিন্ন মানদণ্ড। ইংরেজি মানদণ্ডে জন্ম সময় থেকে বয়স হিসেব করা হয়, আর ভারতীয় মানদণ্ডে গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়ে ভারতীয় হিসেবে যখন ১৬ বছর লেখা হয়েছিল, ইংরেজি হিসাবে সেটা হবার কথা ১৫। সুরেন্দ্রনাথের কাছে যখন এই বৈষম্যের কৈফিয়ৎ চাওয়া হল উনি পরিষ্কার ক'রে তার উত্তর দিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা' অন্যায়ভাবে মানতে চাইল না।

অন্যায়ের কাছে মাথানত করতে জানতেন না সুরেন্দ্রনাথ। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সারেন্ডার নট। ঠিক করলেন, বিলেতের আদালতে মামলা করবেন। চলে গেলেন মিঃ জন ডি. বেল এবং তারকনাথ পালিতের কাছে। তারকনাথ তখন সদ্য ব্যারিস্টার হয়েছেন। আর

কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করার পর মিঃ বেল তখন প্রিভি কাউন্সিল-এ প্র্যাকটিস করছিলেন। মামলার শুনানীর জন্য মিঃ মেলিশ— পরে যিনি লর্ড জাস্টিস অব আপিল হয়েছিলেন— এবং মিঃ বেল-কে ব্রিফ করা হল। ১৮৬৯ সালের ১১ জুন কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশন-এ মিঃ মেলিশ আবেদন করলেন ম্যান্ডামাস-এর জন্য যাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস-এর প্রবেশানার-দের লিস্টে সুরেন্দ্রনাথের নাম পুনর্বহাল হয়। শুনানীর পর আদালত কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শাবার জন্য আদেশ জারি করলেন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ মামলা লড়লেন না। তাঁদের কিছু বলার নেই জেনে আগে থেকেই তাঁরা সুরেন্দ্রনাথের নাম সফল পরীক্ষার্থীদের তালিকায় পুনর্বহাল করলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদে জয়ী হলেন সারেন্ডার-নট। তারপর বাকি পরীক্ষায় সফল হয়ে আই.সি.এস. হয়ে তিনি দেশে ফিরলেন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে কিছুদিন কাজ কবলেন। কিন্তু কযেক বছরের মধ্যেই তাঁকে চাকরি থেকে বেরিয়ে আসতে হল একটি হীন ভারতবিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের ফলে।

তারপর নানান শিক্ষামূলক, সমাজ-কল্যাণ এবং রাজনৈতিক কাজে নিয়োগ করলেন নিজেকে। ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে যোগ হল সাংবাদিকতার কাজ। ঐ সময়ে 'দি বেঙ্গলী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিকানা কিনে নিলেন এবং তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি বেশ ভালোভাবে চলতে থাকে।

তখন আর একটি সংবাদপত্র ছিল 'দি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে। এর সম্পাদক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাস। পেশায় তিনি ছিলেন হাইকোর্টের সলিসিটর। এই পত্রিকায় একটি খবর বেরুলো যে বিচারপতি নরিস (তখনকার কলকাতা হাইকোর্টের জজ) হুগলি নদীতে আগুন ধরাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর জবরদস্তির শেষ নিদর্শন হ'ল তাঁকে দেখাবার জন্য শালগ্রাম শিলা কোর্টে আনবার নির্দেশ। হিন্দু দেবদেবী জিম্মার জন্য আগেকার সুপ্রিম কোর্ট এবং এখনকার হাইকোর্টে অনেক মামলা হয়েছে, কিন্তু কোন হিন্দুর গৃহদেবতার কখনও সৌভাগ্য হয়নি কোর্টে হাজিরা দেবার। কলকাতার ডেনিয়েল (ইংরেজি ভাষায় ন্যায়বিচারের প্রতীক) শালগ্রাম শিলাটি দেখে মন্তব্য করেন যে এ কখনও একশো বছরের পুরনো হতে পারে না। অতএব বিচারপতি নরিস শুধু আইনবিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেই পারদর্শী নন, তিনি হিন্দু দেবদেবীর ব্যাপারেও বিশেষ জ্ঞানী। তিনি যে কি নন, তা বলা শক্ত। কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে ভয় পেয়ে তাঁরা তাঁদের গৃহ দেবতাদের কোর্টে টেনে আনা মেনে নেবেন কি না। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে জনসাধারণের দিক থেকে কিছু করা দরকার যাতে এই তরুণ এবং অনভিজ্ঞ জজসাহেবের খামখেয়ালিপনা বন্ধ হয়।

এই খবরের ভিত্তিতে ১৮৮৩ সালের ২৮ এপ্রিল 'বেঙ্গলী' কাগজে এই সম্পাদকীয়টি বেরোয় :

"এখন অবধি হাইকোর্টের বিচারপতিরা সকলের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে এসেছেন। সন্দেহ নেই, অনেক সময়ে তাঁরা ভুল করেছেন, অনেক সময়ে তাঁরা কর্তব্য পালনে সক্ষম হননি। কিন্তু তাঁদের সে ভুল ক্ষণিকের খেয়াল অথবা বিচক্ষণতার অভাব অথবা শালীনতা বোধের অভাবে হয়নি। এখন কিন্তু আমাদের একজন বিচারপতি এসেছেন— যদি Jeffry আর Scroggs-এর দিনগুলোর কথা মনে না থাকে— যদি অল্প সময়ের মধ্যে এমন অনেক

কিছু করেছেন যা থেকে দেখা যাবে যে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির উচ্চপদের অযোগ্য, এবং স্বভাবে তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতির মর্যাদা রাখার ঐতিহ্য, যা এই উচ্চপদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা রক্ষা করতে অসমর্থ। আমরা মাঝে মধ্যেই বিচারপতি নরিস-এর কোর্টের বিষয় এই কলমে লিখেছি, কিন্তু একটি সমকালীন পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে এ বিষয়ে চরম অবস্থা উপনীত হয়েছে যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।" এর পরে 'দি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর খবরটি যা আমরা আগেই পড়েছি, সেটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১৮৮৩ সালের ৩ মে কলকাতা হাইকোর্ট আদালত অবমাননার জন্য কারণ দর্শাবার নোটিশ (Rule for Contempt of Court) দিলেন সুরেন্দ্রনাথকে। ঐ দিনই তিনি পেলেন এই নোটিশ এবং এফিডেভিট করে কারণ দর্শালেন। প্রথমেই তিনি পরিষ্কার করে বললেন যে ঐ লেখার জন্য বা তা প্রকাশ করার জন্য 'বেঙ্গলী' কাগজের মুদ্রক এবং প্রকাশক রামকুমার দে'র কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। রামকুমার ভাল ইংরেজি জানেন না, এবং সুরেন্দ্রনাথ যতখানি জানেন, রামকুমার ঐ লেখাটি পড়েননি; আর যদি তিনি পড়ে এবং বুঝেও থাকেন, তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিলো না সুরেন্দ্রনাথের এই লেখা ছাপা বন্ধ করার। অতএব রামকুমারের বিরুদ্ধে যে Rule for Contempt of court জারি হয়েছিল, সে ব্যাপারে রামকুমার নির্দোষ।

তারপর তাঁর এফিডেভিটে তিনি লিখলেন যে, মিঃ নরিস কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এইটুকু ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ কিছুই জানেন না। ১৮৮৩ সালের ১৯ এবং ২৬ এপ্রিল 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এ ঐ খবরগুলি বেরিয়েছিল। সেই পত্রিকার সম্পাদক কলকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্নি এবং ঐ খবরগুলির কোন প্রতিবাদ কোনো কাগজে প্রকাশিত হয়নি। তাই তিনি ঐ খবরগুলি সত্যি ধরে নিয়ে জনস্বার্থে লিখেছিলেন 'বেঙ্গলী' কাগজে জনসাধারণের অবগতির জন্য। এই লেখায় তাঁর কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না।

তারপর তিনি লিখলেন যে কোর্টের অফিসারদের যে এফিডেভিটের ভিত্তিতে কারণ দর্শাবার নোটিশ জারি হয়েছে, তা থেকে বুঝতে পেরেছেন যে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এ বিচারপতি নরিস যে জবরদস্তি শালগ্রাম শিলা কোর্টে আনিয়েছিলেন বলে খবর বেরিয়েছিলো তা ঠিক নয়। তিনি চাননি, কিন্তু বাদী-বিবাদী সকলে হিন্দু হয়েও জোর করে শালগ্রাম শিলা আনিয়েছিলেন। অবশ্য এর উল্টো বিবরণও তিনি শুনেছেন, কিন্তু কোনটা যে সত্য তা তাঁর পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়।

তবে তিনি জোর দিয়ে এই কথা বললেন যে তিনি যদি জানতেন যে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এ প্রকাশিত ঘটনাগুলো সত্যি নয়, তাহলে তিনি তাঁর কাগজে যা লিখেছেন তা লিখতেন না। বিভ্রান্ত হয়ে তিনি যা লিখেছেন তার জন্য তিনি দুঃখিত এবং বিনা শর্তে তিনি তা প্রত্যাহার করছেন। তবে তিনি আবার জোর দিয়ে বললেন যে জনকল্যাণই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কোন দুরভিসন্ধি নয়।

তখনকার ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের এমন অবস্থা যে জনসাধারণের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন হাইকোর্টের জজদের খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো জজের অন্য রকম আচার বা ব্যবহার দেখা যায় তাহলে দেশবাসীরা খুবই শঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে ওঠে, এবং সে অবস্থায় তিনি মনে করেন যে, সব সাংবাদিকেরই কর্তব্য যাতে

এ-রকম কোনো অবস্থার উদ্ভব না হয়।

তারপর তিনি লিখলেন যে অজান্তে বিচারপতি নরিস সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তার জন্য তিনি দুঃখিত এবং আদালতের ক্ষমাপ্রার্থী। তা সত্ত্বেও তিনি আইনজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী একটি আইনের প্রশ্ন তুললেন যে, এই আদালতের ঐ রুল জারি করার বা তাঁকে অথবা রামকুমার দে-কে শাস্তি দেবার কোন অধিকার নেই। এ প্রশ্ন জনস্বার্থে খুবই গুরুতর এবং এ-সম্বন্ধে আদালত যেন বিস্তারিত সওয়াল শুনে রায় দেন।

৫ মে মামলাটি আদালতে উঠল। বিচারপতি ছিলেন— প্রধান বিচারপতি গার্থ, বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, বিচারপতি কানিংহাম, বিচারপতি ম্যাকডোনেল এবং বিচারপতি নরিস। সুরেন্দ্রনাথ কোর্টে হাজির হয়ে তাঁর এফিডেভিটটি পড়লেন, এবং বললেন যে মামলা মুলতবি হোক তা তিনি চান না।

এখানে একটু নেপথ্য কাহিনি বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ৩ মে সুরেন্দ্রনাথ কোর্টের সমন পেলেন এবং ৫ মে শুনানী ঠিক হয়েছে জানলেন। সময় খুব অল্প। আরও মুস্কিল হল কোন ব্যারিষ্টার তাঁর ব্রিফ নিতে রাজি না হওয়ায়। মনোমোহন ঘোষ তখন অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী। শেষ পর্যন্ত মিঃ ডব্লু. সি. ব্যোনার্জি রাজি হলেন সুরেন্দ্রনাথের হয়ে দাঁড়াতে পরিষ্কার এক শর্তে— তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তিনি বিচারপতি নরিস সম্বন্ধে যা লিখছেন তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সুরেন্দ্রনাথ এতে রাজি হলেন।

৫ মে তো মামলা উঠল আদালতে পাঁচজন জজের সামনে। সুরেন্দ্রনাথ তখন থাকতেন বারাকপুরে। সেখান থেকে সকালেই কলকাতা চলে এসেছেন। আসার আগে স্ত্রীকে বলে এসেছেন সম্ভবত তাঁকে জেলে পাঠানো হবে। উনি বিছানা-পত্র এবং কিছু বই সঙ্গে করে তার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন।

সকাল সাড়ে দশটায় কোর্টে হাজির সুরেন্দ্রনাথ। কোর্ট চত্বর লোকে লোকারণ্য। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। জনতার মধ্যে দলে দলে ছাত্ররা এসে যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন যাঁরা পরে সরকারের উচ্চপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

বিচারপতিরা কোর্টে আসবেন। কোর্ট-ঘরে লোকে গিজগিজ করছে। তাঁর কৌঁসুলিকে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কোনরকমে এগিয়ে গেলেন। এগারোটা বেজে গেল। কিন্তু জজসাহেবরা তখনও এলেন না। তাঁরা তখন প্রধান বিচারপতির ঘরে পরামর্শ এবং আলোচনা করছেন। পরে সুরেন্দ্রনাথ জেনেছিলেন কিসের পরামর্শ হচ্ছিল, কি শাস্তি দেয়া হবে, তাই নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন। চারজন বিচারপতি জেলে পাঠাবার পক্ষে— এঁরা সবাই ইংরেজ। আর বিচারপতি জরিমানার পক্ষে। শোনা গিয়েছিল যে আগের দিন প্রধান বিচারপতি গিয়েছিলেন বিচারপতি মিত্রের বাড়ি তাঁকে রাজি করাতে যাতে তিনি অন্য চারজনের সঙ্গে একমত হন। কিন্তু তিনি সফল হননি। সেই চেষ্টা আবার হচ্ছিল প্রধান বিচারপতির ঘরে। কিন্তু বিচারপতি মিত্র তাঁর সিদ্ধান্তে অনঢ়। তাঁর বিচারে একই রকম ঘটনায় টেলর-এর মামলায় জরিমানার শাস্তি যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। কাজেই সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও জরিমানাই যথেষ্ট হবে।

শেষ অবধি সাড়ে এগারোটার পর পাঁচজন বিচারপতি কোর্টে এসে বসলেন। চারজনের হয়ে প্রধান বিচারপতি তাঁদের রায় পড়লেন এবং বললেন যে তাঁরা বিচারপতি মিত্রের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তারপর বিচারপতি মিত্র তাঁর আলাদা রায় পড়লেন। চারজনের

সিদ্ধান্ত মতো সুরেন্দ্রনাথের শাস্তি হল দু'মাস প্রেসিডেন্সী জেলে থাকার।

এই রায় বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল— জানলার কাঁচ ভাঙতে আরম্ভ করল তারা, পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল। এই উত্তেজিত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে হাইকোর্টের জজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাস্তাতেও যে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল তারাও সুরেন্দ্রনাথের শাস্তির কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং ধিক্কার দিতে লাগল। কোর্টের গেটের কাছে সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবার জন্য প্রিজন ভান হাজির ছিল, কিন্তু জনতার উত্তেজনা দেখে সে গাড়িতে না তুলে তাঁকে অন্য গাড়িতে করে জজসাহেবদের গেট দিয়ে বার করে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হল। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ আপিল করেছিলেন তখনকার সর্বোচ্চ আদালত প্রিভি কাউন্সিল-এ। কিন্তু সে আপিল সফল হয়নি। অবশ্য যখন এই আদালতের রায় বেরোয়, তার অনেক আগে সুরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিলেন জেল থেকে।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসে। ঐ মাসের ১৪ তারিখে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন বরিশালে হওয়া ঠিক ছিল। বেলা দু'টোয় মিছিল বেরুলো। লাঠি হাতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ ঘোড়ায় চেপে টহল দিচ্ছেন। মিছিল চলছে। পুরোভাগে আছেন সুরেন্দ্রনাথ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি। পেছনে যুবকরা। সুরেন্দ্রনাথরা যখন এগিয়ে গেলেন কিছু হল না। কিন্তু যুবকদের দল যেই রাস্তায় এসে পড়ল পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। নির্বিচারে লাঠি চালাতে লাগল পুলিশ, 'বন্দেমাতরম্' লেখা ব্যাজ যাঁরা পরেছিলেন তা ছিঁড়ে দিল। অনেকে আহত হল এই পুলিশী অত্যাচারে। খবর পেয়েই সুরেন্দ্রনাথরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চললেন অবস্থা দেখবার জন্য। রাস্তায় দেখা হল পুলিশ প্রধান মিঃ কেম্প-এর সঙ্গে। কেম্পকে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, তোমরা অন্যদের মারছ কেন? যদি অন্যায় কেউ করে থাকে সে তিনি নিজে এবং তার জন্য তাঁকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে, তাঁকে বন্দীও করা যেতে পারে। মিঃ কেম্প সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনাকে তো আমি বন্দী করেইছি। তখন মতিলালবাবু এগিয়ে এসে বললেন, তাঁকেও বন্দী করার জন্য। কিন্তু পুলিশ-প্রধান বললেন, শুধু সুরেন্দ্রনাথকে বন্দী করারই হুকুম আছে তাঁর ওপর।

একটি ঠিকে গাড়ি করে বন্দী সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে বিহারীলাল রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। চার জনের বেশি গাড়িতে ধরল না। তাই সহিসের পাদানিতে চেপে বসলেন কাব্যবিশারদ। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এমারসন-এর বাড়িতে। কাব্যবিশারদের পোশাক পছন্দ না হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রেগে গিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। বাকি তিনজনকে ঘরে ঢুকতে দেয়া হল। বিহারীলাল এবং অশ্বিনীকুমার চেয়ারে বসলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসতে যেতেই, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন— আপনি একজন বন্দী, আপনি বসতে পারেন না, আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। বললেন, তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে অপমান করবার জন্য আনা হয়নি নিশ্চয়ই, এবং তিনি আশা করেন ভদ্র ও শালীন ব্যবহার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একবারে রেগে আগুন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা শুরু করলেন এবং তাঁকে তাঁর বক্তব্য

রাখতে বললেন। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, তিনি নির্দোষ, এবং সময় চাইলেন ডিফেন্স-এর জন্য। এমারসন-এর পাশে বরাবর বসেছিলেন আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোক— পরে জানা গিয়েছিল তিনি ছিলেন নোয়াখালির ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বললেন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের উত্তর, কিসের জন্য ক্ষমা চাইব? আদালত অবমাননার জন্য সুরেন্দ্রনাথের দু'শ টাকা জরিমানা হল। বেরিয়ে এসে তিনি টাকা জোগাড় করে এই জরিমানা দিয়ে দেন।

কঠিন এবং অনমনীয় চরিত্রের মানুষ ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ কোনোদিন করেননি তিনি।

তথ্যসূত্র :

1. I L R 1910 Cal. 109 (P.C.)
2. A Nation in Making–*Sir Surendranath Banerjea*
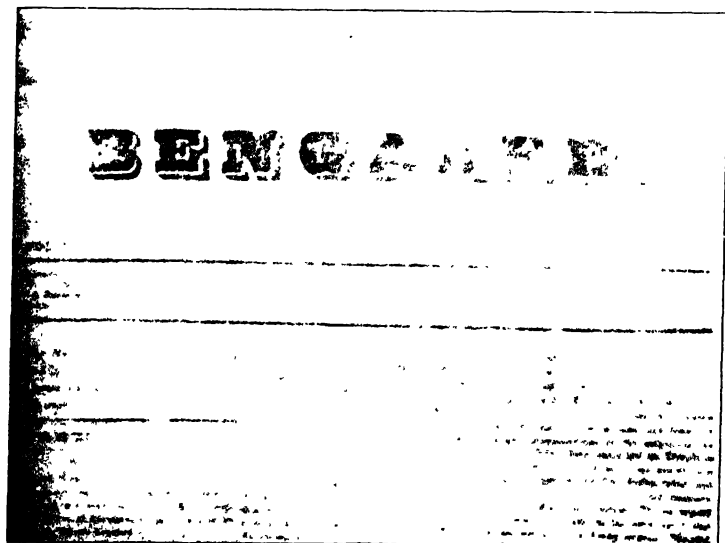
লেখক পরিচিতি : *ব্যারিস্টার, সমাজসেবক ও সুলেখক।*

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও ঔপনিবেশিক বাংলায় মন্ত্রিত্ব

হাসি ব্যানার্জি

বাংলা তথা সারা ভারতে জাতীয়তাবাদী নেতা রূপে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সমধিক পরিচিত। ১৮৭৬ সালে ভারতসভা (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন) স্থাপন এবং তৎপরবর্তী দশকে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) উষালগ্ন থেকে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন (মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড অ্যাক্ট) বলবৎ হওয়ার কাল পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আগমনের পূর্বে যে তিনিই ছিলেন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সীমিত আন্দোলনের অন্যতম মূল প্রবক্তা— এ তথ্য বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে সরে আসেন এবং ১৯১৯ সালে মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কারের দ্বারা যখন প্রদেশগুলিকে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয় তখন তিনি বাংলা সরকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

মন্ত্রী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কতখানি অবহিত ? এই প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মন্ত্রিত্বের সাফল্য, ব্যর্থতার একটি সামগ্রিক নিরীক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

১৯১৯ সালে ভারতশাসন আইনের দ্বাবা প্রদেশগুলিতে একধরনের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি (যেমন অর্থ, রাজস্ব, বিচার ইত্যাদি) পূর্বের ন্যায় সংরক্ষিত রইল ইওরোপীয় সদস্যবর্গের হাতে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি (যেমন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) হস্তান্তরিত হল ভারতীয় মন্ত্রীদের কাছে। সেই অনুযায়ী তৎকালীন বাংলার রাজ্যপাল লর্ড রোনাল্ডশো সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তরের ভার দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে (এ নেশন ইন মেকিং) লিখেছেন যে, মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব থেকেই তার উচ্চাশা ছিল যে তিনি কার্জন প্রস্তাবিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট (১৮৯৯)-এর পরিবর্তন সাধন করবেন। একদা তিনি যে এই আইনের প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছিলেন, সেই স্মৃতি তার মনে জাগরুক ছিল।

কলকাতা কর্পোরেশন ১৮৭৬ সালে প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে গঠিত হয়। তখন দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত হত। ১৮৮৮ সালে এই আইনের সংশোধন হয় এবং আরও কিছু অঞ্চল এর এক্তিয়ারে আসে। কিন্তু ১৮৯৯ সালে যে সংশোধন হয় তার দ্বারা নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করা হয় এবং কর্পোরেশনের ক্ষমতাও নানাভাবে খর্ব করা হয়। এই প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব পাবার পরেই সচেষ্ট হন। তাঁর নীতি ছিল যথাসাধ্য গণতান্ত্রিক নীতি

অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া। সেই কারণে ১৯২১ সালে নতুন বিলটি পেশ করার আগে তিনি একটি সভা আহ্বান করে ইওরোপীয় ভারতীয়, সরকারি এবং সরকারের বাইরে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিলটির সপক্ষে জনমত সংগ্রহের চেষ্ট করেন। ১৯২১ সালের নভেম্বরে বিলটি কাউন্সিলে পেশ হয়। এর দ্বারা কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা ৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৮০ করা হয়। সরকারের মনোনয়ন ক্ষমতাও ১৫ থেকে ৮-এ সংকোচন করা হয়। সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী ৫৫ জন সদস্য নির্বাচন করবে (যা ছিল পূর্বে মাত্র ২৫ জন) সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলী যেমন সাধারণ নির্বাচিত- ৫৫, চেম্বার অব কমার্স : ৬, ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন : ৪, পোর্ট কমিশনার : ২, কর্পোরেশন অল্ডারম্যান : ৫ মিলিয়ে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা হল ৭২ যা কিনা পূর্বের দ্বিগুণ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে প্রস্তাবিত বিলটি ছিল কলকাতা কর্পোরেশনের গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় একটি বিরাট পদক্ষেপ। বিলে আরও বলা হয়েছিল যে সভাপতি বা মেয়র এবং প্রধান প্রশাসক দু'জনেই নির্বাচিত হবেন। ভোটাধিকারের ভিত্তি প্রসারিত হয়েছিল। ভোটদানের ব্যবস্থাও নিষিদ্ধ করা হল। সুরেন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মনোভঙ্গীর আরও প্রতিফলন ঘটল মহিলাদের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত করার মধ্য দিয়ে। বিলটির আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল অল্ডারম্যান নিয়োগ করার প্রস্তাব। এর দ্বারা কর্পোরেশনের মর্যাদা বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন "(It) divides our community into watertight compartments and make us think and act like partisans and not as citizens, as Hindus or Muhammedans and Christians, not as Indians and it must, therefore, interfere with the evolution of that citizen spirit which is fundamental to the development of nationhood."

এই আদর্শ অনুযায়ীই তিনি সাধারণভাবে নির্বাচিত সদস্য তালিকায় ১৩টি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করেন। কিন্তু বিলটি পেশ হওয়ার পর এই প্রস্তাবটি মুসলমানদের কাছে কঠোর সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত হল নন অফিসিয়াল ইওরোপীয় গোষ্ঠী যারা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন নীতিগতভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। অস্পৃশ্য হিন্দুরা এর সঙ্গে যুক্ত হল। বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষের অন্ত ছিল না এবং হিন্দুদের মধ্যেও কেউ কেউ মুসলমানদের সপক্ষে ছিলেন। সরকারও এ বিষয়টিতে ঐক্যবদ্ধ ছিলে না। পরিস্থিতি খুবই জটিলাকার হয়ে ওঠে এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রায় পরাজয়ের সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় একজন নন-অফিসিয়াল ইওরোপীয় সদস্য প্রস্তাব করেন যে প্রথম ৯ বৎসর মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হবে এবং তারপরে মুসলমানদের জন্য সাধারণ নির্বাচনমণ্ডলীতেই সংরক্ষিত আসন থাকবে। সবদিক বিবেচনার পর সুরেন্দ্রনাথ এই মীমাংসা প্রস্তাবে সম্মত হন।

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা যে সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত নিরূপায় হয়েই মেনে নিয়েছিলেন এবং কেবলমাত্র সাময়িকভাবে ৯ বছরের জন্য একথা অনেকেই বিস্মৃত হন। এবং চরমপন্থীরা বিলটির অন্যান্য গুণাবলী বিচার না করেই তাকে কঠোর সমালোচনা করেন। এমন কি 'বেঙ্গলী' পত্রিকাও এ ব্যাপারে একই মত প্রকাশ করে— Sir Surendranath Banerjee's acceptance of the dogma means tabooing of the reforms

and the time forces. We do not know what glamour there may be in the office which he holds ... Sir Surendranath Banerjee may have saved himsellf and the Calcutta Municipal Bill from going into the scrapheap but will he search his heart and find at what cost?'

সুরেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন যে, মূল বিলটিতে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের কথা ছিলই না। ইতিপূর্বে ১৯১৭ সালে লর্ড সিন্‌হার বিলে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। বর্তমানেও তিনি সাম্প্রদায়িক প্রথার স্থায়ী স্বীকৃতি এড়াতেই সাময়িকভাবে ৯ বছরের জন্য প্রস্তাবটি অনুমোদন করছেন। যদি তিনি পরাজিত হতেন তাহলে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা স্থায়ীভাবে আইনগত স্বীকৃতি পেত।

পরিহাসের বিষয় এই যে যাঁরা তাঁকে সমালোচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই স্বরাজ্য দলই সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা মেনে নিয়ে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি (১৯২৪) করেন যার দ্বারা শুধু কর্পোরেশনেই নয় অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিতেও সাম্প্রদায়িক নীতি প্রসারিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী থাকাকালীন গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা প্রগতিশীল ও আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে আরও দুটি বিল প্রস্তাব করেন। এর মধ্যে একটি হল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট (১৮৮৪) (সংশোধনী) আইন এবং অপরটি ছিল বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট (১৮৮৫) (সংশোধনী) আইন। এর মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ থেকে বাড়িয়ে তিন চতুর্থাংশ আবার কোথাও কোথাও চার পঞ্চমাংশ করার প্রস্তাব ছিল। বিলে বলা হয়েছিল শিল্পাঞ্চল ব্যাতীত কোন মিউনিসিপ্যালিটিতেই মনোনীত চেয়ারম্যান বা মনোনীত কমিশনার থাকবে না। আবার শিল্পাঞ্চলেরও সীমানাস্থিত জায়গায় যদি সাধারণ জনগণ (যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নন) বসবাস করে তবে সেখানে তাদের নিজস্ব নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকবে। এই বিলগুলি পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে সুরেন্দ্রনাথ মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের সবরকম আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হ্রাস করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠা করে তার যথাসাধ্য গণতন্ত্রীকরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই বিলগুলি হয়তো চিন্তাধারার দিক থেকে 'বৈপ্লবিক' ছিল না কিন্তু এর প্রগতিমুখীনতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু এই বিলও সাম্প্রদায়িকতার পাথরে হোঁচট খেতে বাধ্য হয়। মুসলিম সদস্যরা অভিযোগ করেন যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করা হয়নি। বিলগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেও বর্ণনা করা হয় কারণ জনস্বার্থের খাতিরেই কিছু ক্ষমতা সরকার সংরক্ষিত রাখেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে এই বিলগুলির মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির যে বিপুল ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হল তার যাতে কোন অপব্যবহার না হয় সেজন্যই তিনি কিছু সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। তিনি একথা বলেও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে সরকারি নিয়ন্ত্রণক্ষমতা স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হবে। তিনি নিজে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তিনি একথাও বলেন যে ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটিতেও কিছু সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে। এই

বিলগুলি নিয়ে অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ আর বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। কারণ ইতিমধ্যে ১৯২৩ এর সেপ্টেম্বরে প্রথম কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়।

সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রী থাকাকালীন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ইউনিয়ন বোর্ডগুলি থেকে সরকারি সদস্য সংখ্যা কমানো এবং নির্বাচন প্রথা চালু করা। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে পাঁচটি ইউনিয়ন বোর্ড ব্যতীত অন্য সবগুলিতেই বেসরকারি সদস্যরা চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত। সুরেন্দ্রনাথ বাকি পাঁচটি বোর্ডে এই প্রথা চালু করেন। স্থানীয় বোর্ডগুলির ক্ষেত্রেও সরকারি নির্দেশ জারি করেছিলেন যে সরকারি সদস্যরা চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। এটিও ছিল স্থানীয় বোর্ডগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার একটি প্রয়াস।

সুরেন্দ্রনাথ গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অ্যাক্ট (১৯১৯) অনুসারে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনে সচেষ্ট হন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একাজে তিনি নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রথমত, ইউনিয়ন বোর্ড সংখ্যা বৃদ্ধির প্রকল্প স্থানীয় সরকারি অফিসারের সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল এবং একাধিক ক্ষেত্রে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় অফিসারের অসহযোগিতায় প্রকল্প রূপায়িত হয়নি। কিন্তু এর থেকেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় অসহযোগ আন্দোলনকারীরা এবং গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর একটি উদাহরণ হল মেদিনীপুর জেলার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কার্যকলাপ। তারা ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের বিরুদ্ধে নানা অপব্যাখ্যা চালায় এবং গ্রামবাসীদের বোঝানো হয় যে, এই বোর্ড গঠিত হলে তাদের বর্ধিত হারে কর দিতে হবে। স্থানীয় কাগজ 'নিহার'-এর মাধ্যমে একথাও প্রচার হয় যে ইউনিয়নবোর্ডগুলি স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে ইংল্যান্ডের 'ইয়র্কশায়ার টাউনস্'-এর মডেল স্থাপিত হচ্ছে এই প্রচার এতই কার্যকরী হয় যে কাঁথিতে ইউনিয়ন বোর্ড সদস্যরা কাজ বন্ধ করে দেয় এবং তহশিলদারদের দ্বারা চৌকিদারি কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে হয়। কাঁথির ঘটনা ক্রমশ মেদিনীপুরের অন্যান্য অঞ্চলেও সংক্রমিত হয় এবং এই মিথ্যা প্রচারের ফলে সরকার বাধ্য হয়ে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড কার্যত বন্ধ করে দেয়।

পরবর্তীকালে যথেষ্ট ক্ষোভ ও হতাশার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী হিসাবে তিনি কলকাতা কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা ইউনিয়ন বোর্ডের যে গণতন্ত্রীকরণ করতে চেয়েছিলেন তা অনেকাংশেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ যেমন, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল এবং অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বাধা দানের ফলে (যেমন, মেদিনীপুরে ইউনিবোর্ড স্থাপনের ঘটনা) যথোপযুক্ত ফলপ্রসু হয়নি।

১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি শহরে এবং গ্রামে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে এর একটি গণতান্ত্রিক রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ড সর্বত্রই সরকারি সদস্য সংখ্যা কমিয়ে বেসরকারি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। নির্বাচন প্রথা চালু করা এবং নির্বাচিত সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা যথাসাধ্য শিথিল করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ধরনের সংস্কার পরিকল্পনা প্রায়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হয়নি এবং সুরেন্দ্রনাথ

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের এবং তজ্জনিত ব্যর্থতার কারণে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের লক্ষ্য হন।

কিন্তু অসহযোগীরা বা পরবর্তীকালের স্বরাজ্যদল কেউই পর্যালোচনা করে দেখেননি যে কি গভীর প্রতিকূলতার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথকে মন্ত্রী হিসাবে কাজ চালাতে হয়েছিল।

প্রথমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাৎপরবর্তী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাকালীন সময়ে প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসন চালু হয়েছিল। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছিল ১৯২০ সালের ভয়ানক অনাবৃষ্টি। এই পটভূমিকায় ১৯১৯ সালে শাসনসংস্কার চালু হয় এবং শুরু থেকেই বাংলার মন্ত্রীরা অর্থনৈতিক ঘাটতির সম্মুখীন হন। এর উপরে আবার ছিল 'Meston Award' যার দ্বারা প্রদেশগুলিকে নতুন কর বসাতে এবং ব্যয় সংকোচন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক সংকট আবার বাংলায় বিশেষ প্রকটাকার ধারণ করে। মন্ত্রিত্ব পাবার আগে থেকেই সুরেন্দ্রনাথ ভারতসচিব মন্টাগুর কাছে বাংলার এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের কথা তুলে ধরেন। ভারত সরকারের কাছেও বাংলার আর্থিক ঘাটতির কথা জানান। কাজেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে বাংলার দারুণ আর্থিক দুরবস্থার চিত্রটি সহজেই অনুমেয়। তিনি ভারতসচিবকে লেখেন : 'As for ministers our position will be difficult if not impossible.....' এবং অনুরোধ করেন, (to) Save situation full of peril to the success of reforms in Bengal' ১৯২১-২২ সালের বাজেট সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হিসাবে যোগদানের পূর্বেই ঘোষিত হয়েছিল। ১৯২২-২৩ সালের বাজেটও খুবই সংকুচিত ছিল। এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়সংকোচনের ফলে কোন নতুন প্রকল্প কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

তিনি যথার্থই গভীর খেদের সঙ্গে লিখেছিলেন যে ''In Bengal at least it would have been difficult to raise the cry of the failure of reforms if there were more money at the disposal of ministers and if it could have been liberally distributed among the nation building departments...'.

আর্থিক সমস্যা ছাড়াও মন্ত্রী হিসাবে কৃতকার্য হওয়ার পথে আরও একটি বাধা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের লক্ষ্যে দ্বৈত শাসন একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেও এর ত্রুটিগুলি প্রকট হয়ে পড়ে। যেমন, হস্তান্তরিত বিষয়গুলির (স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা ইত্যাদি) দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সংরক্ষিত বিভাগের (অর্থ, রাজস্ব, বিচার বিভাগ ইত্যাদি) সঙ্গে আলোচনা না করে কোন কাজ করার উপায় ছিল না। হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পরিধি না থাকায় ক্রমাগত 'overlapping' এবং 'impinging' হত। মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে তাদের বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। অর্থ দপ্তরের (সংরক্ষিত) অনুমোদন ছাড়া কোন পরিকল্পনাই সুরেন্দ্রনাথ কার্যকরী করতে পারতেন না। অর্থদপ্তরের হস্তক্ষেপ এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিভাগগুলির কাজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকায় এমন অনেক বিষয় যা কিনা মন্ত্রীদের এক্তিয়ারে পড়ে না, সেগুলির জন্যও সুরেন্দ্রনাথ সমালোচনার শিকার হন, যেমন, ১৯১৯ সালে দার্জিলিং-এ চা বাগানের কুলিদের ঘটনা। নানারকম অসন্তোষ, অভিযোগে বিক্ষুব্ধ কুলিরা চা বাগান ত্যাগ করে

এবং চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে কুলিনিগ্রহের ঘটনায় অসহযোগীরা মন্ত্রীদের উপর দোষারোপ করে। সুরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন যে ঘটনাটি হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কুলিদের সপক্ষে কিছু না করার অভিযোগ আনীত হয়। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে বিধ্বংসী বন্যাও এরূপ একটি ঘটনা যার জন্য মন্ত্রীদের দায়ি করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ত্রাণকার্যের ব্যাপারটি সংরক্ষিত বিভাগের আওতায় ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিংয়ে ছিলেন এবং বন্যাদুর্গত অঞ্চলে স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় ত্রাণকার্যের কিছু সহায়তাও করেন, কিন্তু এ কাজের জন্যও তিনি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা কর্তৃক সমালোচিত হন। অনেক সময়েই সুরেন্দ্রনাথ সংরক্ষিত বিভাগের দপ্তরগুলির কার্যকলাপের জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। অথচ ১৯১৯ সালের শাসন আইন অনুযায়ী হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে তাঁর কোন দায়িত্ব ছিল না।

বাংলার ক্ষেত্রে অসহযোগ আন্দোলন মন্ত্রীদের কার্যকলাপের পথে এক প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথ খেদের সঙ্গে ব্যক্ত করেন যে মন্ত্রী হবার অব্যবহিত পরেই কলকাতার 'টাউন হল'-এ একটি সভা আহ্বান করেন এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে লোকের মতামত ও সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু সংবাদপত্রে এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা হয়। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে যেখানেই তিনি আলোচনা করতে যান স্থানীয় অসহযোগ আন্দোলনকারীরা হরতাল করে তার কাজে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, সুরেন্দ্রনাথের নীতি ছিল ক্রমান্বয়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রকের ভারতীয়করণ করতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করে তিনি সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে (কর্পোরেশনের একজন নির্বাচিত সদস্য) কর্পোরেশনেব চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ ছিল কারণ চেয়ারম্যানের পদটি তখনও পর্যন্ত আই.সি.এস-দের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি যাতে কোন ভারতীয় নির্বাচিত সদস্য পায় তার জন্য তিনি বহু লেখালেখির পর ভারত সরকার এবং লন্ডনস্থিত ভারত সচিবের সম্মতি আদায় করেন। এর জন্যও তাকে অনেক তিক্ত মন্তব্য শুনতে হয়। অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল যে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সরকারের কঠোর সমালোচক ছিলেন। অতএব তাকে বশে আনার জন্যই সুরেন্দ্রনাথ তাকে এই চেয়ারম্যানের পদ দ্বারা প্রলুব্ধ করেন। শুধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই সুরেন্দ্রনাথ তাকে এই পদ দিয়েছেন। আরও বিপদ ছিল এই যে কাউন্সিলের ভিতরেই কিছু সদস্য ছিল যারা বাইরে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মুসলমান সদস্যরা অনেক সময়ই হিন্দু সদস্যদের সঙ্গে সহমত হতেন না। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী থাকাকালীন প্রতি পদক্ষেপেই যে দুস্তর বাধার সম্মুখীন হন তার কিছু আভাস পাওয়া গেল। তার গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি অনেকাংশেই অর্থাভাবে সংকোচন করতে হয় এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চাপে ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন করে উঠতেও পারেননি। যৌথ দায়িত্বের অভাব এবং অর্থদপ্তরের প্রাধান্য তো ছিলই। সবকিছুর উপরে কাউন্সিলের বাইরে অসহযোগ আন্দোলনের যে জোয়ার তা মন্ত্রীদের কার্যকলাপকে এক উপহাসে পরিণত করেছিল।

এইরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন মন্ত্রী সত্যিই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবেন যদি তিনি তার মূল পরিকল্পনার কোন খণ্ডিত, সংকুচিত অংশও রূপায়িত করতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, 'While the unfortunate author of the

scheme which but imperfectly came upto his own expectation or ideal was prevented by the vow of silence and the obligation of his own office from revealing the secrets of his own prison.

সুরেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে নিজের বিবেকের কাছে সৎ থাকা ছাড়াও একজন জননেতার কাছে সবচেয়ে কাম্যবস্তু হল তাঁর দেশবাসীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা লাভ করা। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯২৩ সালে মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নেন—এই সময়ে দেশবাসী তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। একদা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতা 'স্যার সারেন্ডার-নট' এখন মন্ত্রিত্বপদলোভী 'স্যার সারেন্ডার' বলে ধিক্কৃত হলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে জনৈক পত্রলেখকের Robert Browining-এর Lost Leader কবিতা থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশ করে—

> "Just for a handful of silver he left us,
> Just for a riband to stick in his cost."

সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পড়লেই বোঝা যায় কতখানি সদিচ্ছা নিয়ে তিনি কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণের এবং পরবর্তীকালের কাজের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন এবং নানারূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন সেই অসহযোগ-আন্দোলনকারীদের একাংশই কিন্তু পরবর্তীকালে স্বরাজ্য দল গঠন করে কাউন্সিলে প্রবেশের নীতি গ্রহণ করে। প্রথমদিকে তাদের কাউন্সিল অচল করার নীতি কিছু চমক সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে বিশেষ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে সেই নীতি কার্যত পরিত্যক্ত হতে থাকে। দেখা যায় লিবারেল দলের নীতিই (সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই দল ১৯১৮ সালে স্থাপন করেন) যদিও তাদের বা তাদের সংগঠনের নামে নয়—অনুসৃত হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচারে পরবর্তীকালে স্বরাজ্যদলের কার্যকলাপ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বাংলায় সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্বকাল এক উচ্চাদর্শ, সদিচ্ছা ও কঠোর পরিশ্রমের ইতিহাস। প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক জীবনের স্থূল মানদণ্ডে সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্বকালের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বার্ক, সেরিডান, মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডির আদর্শসমৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথও বলতে পারতেন :

> "Not on the Vulgar mass
> Called 'work', must sentence pass,
> ....
> All I could never be,
> All, men ignored in me,
> This, I was worth to God, whose wheel
> The pitcher shaped"

গ্রন্থতালিকা :

1. Surendranath Banerjee, *A Nation in Making*
2. Surendranath Banerjee, *Trumpet Voice of India*, Madras, 1910
3. J. H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal*
4. Hasi Banerjee, *Political Activity of the Liberal Party in India*, K. P. Bagchi
5. Robert Browning, *A Selection from Poems*, Cambridge, 1929
6. Report of the Committee (Muddiman Committee) to report on the warking of the Reforms, 1924. Govt. of India Publication
7. Bengal Legislative Council Progs. 1921-23
8. Govt. of Bengal, Local self Govt. Deptt. Files, State Archives Govt, of West Bengal

লেখক পরিচিতি : *অধ্যাপিকা ও গবেষিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

বারাকপুরে এক ঐতিহাসিক নির্বাচনী দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রগুরু

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ নভেম্বর ১৯২৩, ছিল বেঙ্গল কাউন্সিলের নির্বাচনের দিন। স্যার, পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রগুরু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার অনুযায়ী তখন বাংলার প্রাদেশিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। এই নির্বাচনে তিনি ছিলেন একজন প্রার্থী এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বরাজ্য দলের তরুণ নেতা প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আসল লড়াই কিন্তু প্রবীণ নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের। যে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্যার হেনরী কটন এক সময়ে লিখেছিলেন যে মূলতান থেকে ঢাকা ভারতের সর্বত্র যাঁর নামমাত্রিক জাগ্রত জনগণের মধ্যে আলোড়ন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তাঁর ব্রিটিশ সরকারের অধীন প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণকে দেশবন্ধু সহ অন্য অনেক নেতাই কেবল পছন্দ করেননি তাই নয়, তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এর দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি অবিচারই করেছেন। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব যে সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণও ছিল, কিন্তু সেই সময়ে দেশবন্ধু সহ চরমপন্থী নেতারা এই প্রকৃত মর্মটা উপলব্ধি করতে পারেননি এবং সেইজন্যে এই নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

নির্বাচন কেন্দ্র ছিল অ-মুসলিম নির্বাচন ক্ষেত্র অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তর অংশের পুর এলাকাগুলি— কাশীপুর থেকে কাঁচড়াপাড়া প্রায় দৈর্ঘ্যে তিরিশ মাইল থেকে প্রস্থ ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। ভোট গ্রহণ হয় দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা বত্রিশটি বুথে। এই নির্বাচন জনমানসে কি রকম সাড়া জাগিয়েছিল তা বোঝা যায় সেই সময়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভোট পড়া নিয়ে।

নির্বাচনে জয়লাভের জন্য দু-পক্ষই যত প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় তা করেছিলেন এবং উভয় পক্ষই নির্বাচন ক্ষেত্রটিকে নানাভাবে সেবা করার চেষ্টা করেছেন, পদযাত্রা করেছেন, ভোটারদের কাছে নানা প্রতিশ্রুতি ও আশা দিয়েছেন, নানা রকমের পোস্টারে সারা এলাকা ছেয়ে দিয়েছেন, ছোট পুস্তিকা, লিফ্‌লেট ভোটারদের মধ্যে বিলি করেছেন। কোনো পক্ষের অর্থ অথবা কাজের লোকের অভাব ছিল না এবং ভোটের দিন মোটর গাড়ির যাতায়াত ও আওয়াজ গ্রামগঞ্জের মানুষজন ও ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথের গাড়িগুলিতে হলদে পতাকা লাগানো ছিল এবং পতাকাগুলির দু'পাশে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রটি মুদ্রিত ছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বা স্বরাজ্য দলের পতাকা ছিল তেরঙা এবং সেগুলোতে লেখা ছিল 'দেশবন্ধুর অনুরোধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আপনারা ভোট দিন।' স্যার সুরেন্দ্রনাথের দলের লোকেরা গলায় গোলাপি পুঁথির মালা পরেছিল, আর স্বরাজীদের গলায় ঝুলছিল পিচ্‌বোর্ডের ওপর আঁকা রেডক্রসের চিহ্ন ও তাকে ঘিরে লেখা

ছিল বন্দেমাতরম্ ও লোকশক্তি। স্বরাজী স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রচার করেছিলেন যে "স্যার সুরেন্দ্রনাথ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই তাঁকে একটি ভোটও নয়। বাংলা আশা করে বারাকপুর তার কর্তব্য করবে, অর্থাৎ স্যার সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করে ডাঃ বিধানচন্দ্রকে জয়যুক্ত করবে।" যাঁরা কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী ছিলেন তাঁরা ভোট বয়কটের জন্যে প্রচার করেছিলেন। কারণ স্বরাজীরা কংগ্রেসের পরামর্শ না মেনে এবং অসহযোগের নীতি অমান্য করে নির্বাচনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের আরও আবেদন ছিল যে মাহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে যখন জেলে আটক রাখা হয়েছে তখন নির্বাচন বয়কট করাই উচিত। অর্থাৎ, নানাভাবে নির্বাচন বেশ জমে উঠেছিল এবং নির্বাচনের দিন সকাল ৭.৩০ মিঃ থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বহু ভোটার তাঁদের ভোট প্রদান করেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়ে। বেশি ভোট পড়ে কাশীপুর, চিৎপুর, বরানগর, টিটাগড় ও বারাকপুর এবং নৈহাটি ও দমদমে আশানুরূপ সাড়া লক্ষ্য করা যায়নি। এই দুই স্থানে দু-পক্ষেরই নির্বাচনী লোকজন কম ছিল। তবে অনেক ছাত্র স্যার সুরেন্দ্রনাথকে ভোট দেবার জন্য বিভিন্ন স্থানে ভোটারদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল। সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র-প্রীতি ও তাদের কল্যাণের জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা হয়তো এর কারণ। অবশ্য কাশীপুরে প্রায় দুই শত মেডিক্যাল ছাত্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্যে প্রচারে অংশগ্রহণ করে।

কাশীপুর পুরসভা কার্যালয়ে সভায় সুরেন্দ্রনাথের লোকজন ভোটারদের কাছে আবেদন করেছিল 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভোট দিন'। এখানে ভোট হচ্ছিল দ্বিতলে এবং সিঁড়িতে দু-পক্ষই ভোটারদের টানাটানি করছিল। টিটাগড় ভোটকেন্দ্রে বেশিরভাগ ভোটার দিয়েছিল আশপাশের মিল থেকে আসা অশিক্ষিত মজুরেরা। তারা বলাবলি করছিল যে তারা ডাক্তার বাবুকে ভোট দিতে এসেছে কারণ তিনি 'জনগণের লোক' এবং 'দেশের সেবা করেন'। বরানগর ও নৈহাটিতে ভোট চলাকালীন কিছু গণ্ডগোলের আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে দেশবন্ধুর উপস্থিতিব জন্যে গণ্ডগোল বেশি বাড়তে পারেনি। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে উৎসাহী জনগণের মধ্যে হাতাহাতি বেঁধে যায়। কিন্তু পুলিশী তৎপরতায় তা বেশিদূর গড়াতে পারেনি। কাশীপুরে একটি বাড়িতে পুত্র পিতার বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দান করে এবং এক নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথকে ভোট দেবার জন্যে তাঁর প্রতিবেশীকে মাঝ পথে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন।

ভোটের দিন যে সব রাজ্য ও জাতীয় স্তরের নেতাগণ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন— ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী, সন্তোষকুমারী গুপ্তা প্রমুখ এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে মাননীয় প্রভাষচন্দ্র মিত্তির, মেজর হাসান সুরাবর্দি, প্রিয়নাথ সেন, রায়বাহাদুর ফণীন্দ্রনাথ দে, রায়বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত প্রমুখ। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র দু'জনেই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে গিয়েছিলেন এবং দু'জনকেই খুশি দেখাচ্ছিল ও উভয়েই নিজ নিজ জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু ভোট শেষ হবার ঘণ্টাখানেক পুর্বে স্যার সুরেন্দ্রনাথের লোকজনেরা বরানগর, কাশীপুর, ভাটপাড়া প্রভৃতি ভোটকেন্দ্র ছেড়ে চলে আসে, কারণ তাদের ধারণা হয়েছিল যে ডাঃ বিধানচন্দ্র এই সব কেন্দ্রে অনেক ভোট পাবেন।

৩০ নভেম্বর, ১৯২৩ আলিপুর থেকে যখন বারাকপুর নির্বাচন ক্ষেত্রের ফল ঘোষণা করা হল তখন দেখা গেল ডাঃ বিধানচন্দ্র ৩৪০৫ ভোটে স্যার সুরেন্দ্রনাথকে হারিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। বাঙালি যে বিস্মৃত জাতি তা আরও একবার প্রমাণিত হল, এক সময়ের

'মুকুটহীন রাজা' তাঁরই প্রতিবেশীদের দ্বারা পরাজিত হলেন। এই পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রগুরু স্বয়ং লিখেছিলেন যে চরমপন্থী কাগজগুলিতে তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চলছিল ও দেশবন্ধু তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনে এটিকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

এই নির্বাচনের প্রায় আট দশক পরে, অর্থাৎ ২০০২ সালে আমরা যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে লক্ষ্য করব যে যেজন্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ রাষ্ট্রগুরুর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, অর্থাৎ তদানীন্তন সরকারের সঙ্গে স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতা, পরববর্তী পর্যায়ে দেশবন্ধু নিজেই তাঁর ভুল স্বীকার করে ১৯২৫ সালের মে মাসে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করলেন যে সরকারের সঙ্গে সম্মানজনক সহযোগ করতে তিনি প্রস্তুত। নেতৃত্বের মোহ যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে তখন মহৎ মানুষের অবদান বা তাঁর থেকে দেশের আরও প্রাপ্তি আমরা বিস্মৃত হই। মর্মাহত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ জনজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

['নারী জগৎ' পত্রিকার সম্পাদিকা দেশবন্ধু গবেষিকা হেনা চৌধুরীর সৌজন্যে কুমার কৃষ্ণ সেনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথার সহায়তায় লিখিত।]

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সৌজন্য : 'এ নেশন ইন মেকিং' (১৯২৫)

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট সমাজসেবক*

বঙ্গভঙ্গ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দপ্রসাদ রায়

বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব ১৮৫৪ সালে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে দেওয়া হলে—এই বিশাল অঞ্চল একজন শাসকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলার থেকে আলাদা করে পৃথক প্রদেশ গঠন করলেন কাছাড়-গোয়ালপাড়া-শ্রীহট্ট এই তিন জেলাকে (বাংলা-ভাষাভাষী) আসামের সাথে যুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে আসাম ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা উঠেছিল। এর প্রায় দু'দশক বাদে আসামের চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুবিধার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মন সিংহ জেলাকে আসামের সাথে সংযুক্তির কথা বলেন। জনরোষে সেটা বানচাল হয়ে যায়। ১৯০৩ সালে বাংলার ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার আসামের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে জোড়ার নতুন প্রস্তাব করেন। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার সাহেব ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রসচিব হার্বার্ট রিজলিকে দিয়ে ২.২.১৯০৫ তারিখে প্রস্তাবটি পেশ করান। নতুন পরিকল্পনায় বেরিয়ে আসে ঢাকা বিভাগ, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ জেলা ও দার্জিলিং অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে যে প্রদেশ গড়ে উঠবে তার রাজধানী হবে ঢাকা। একজন ছোটলাট (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) দ্বারা এই প্রদেশ শাসিত হবে। আর বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হবে মূল বাংলা প্রদেশ এবং রাজধানী হবে কলকাতা। বাঙালিকে খর্ব করার এই কৌশলকে জনমন সাদামনে ঠিক মেনে নিতে পারেনি।

তদানীন্তন ভারত সচিব ব্রডরিক প্রস্তাবটি অনুমোদনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালি প্রচণ্ড আঘাত পাবে এবং ক্রোধে ফেটে পড়বে। কিন্তু কার্জনের চাপের কাছে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হয়। ১৯০৫ সালের ৯ জুন প্রস্তাবটি অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। তড়িঘড়ি করে কার্জনের তৎপরতায় ১৯ জুলাই বিজ্ঞপ্তি জারি হয় এবং ১৬ অক্টোবর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্যকরী হয়।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার আগে ২.২.১৯০৫ তারিখে ভারত সচিব জন ব্রডরিককে কার্জন এক নোট পাঠান, তাতে উল্লেখ থাকে, ''কলকাতা হল সারা বঙ্গপ্রদেশ, এমনকি ভারতবর্ষেরও কংগ্রেস দল পরিচালনার কেন্দ্র। যে নেতারা আদতে পার্টি চালান তাঁদের এবং প্রগলভ বাগ্মীদের নিবাস এই শহর ... এদের কূটকৌশল এবং স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা অসামান্য। এরা জনমত তৈরি করে, এরা উচ্চ আদালতের উপর প্রভাব খাটায়; এবং স্থানীয় সরকারকে ভয় দেখায়; এবং ভারতবর্ষের সরকারকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম। এদের ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য হল এমন এক শক্তপোক্ত সংগঠন তৈরি করা যার সাহায্যে, ভবিষ্যতে কোনও দুর্বল

সরকার পেলে, তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করানো যায়। তাই বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করতে পারে, কোনও বিকল্প শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি করতে পারে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র কলকাতার আধিপত্য ক্ষুন্ন করতে পারে, সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিলেই হল্লা শুরু করবে।''

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলা তার ১৫টি জেলায় অধিকারচ্যুত হল। ফলত বাংলা প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা কমে দাঁড়াল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। মোট এই লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ৪ কোটি ২ লক্ষ, মুসলমান ৯০ লক্ষ। অপর দিকে পুনঃগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মোট লোকসংখ্যা হল ৩ কোটি ১০ লক্ষ, যার মধ্যে হিন্দু ১ কোটি ২০ লক্ষ ও মুসলনান ১ কোটি ৮০ লক্ষ। খণ্ডিত দুই প্রদেশে লোকসংখ্যা মিলিতভাবে দাঁড়াল ৫ কোটি ২২ লক্ষ ও মুসলমান জনসমষ্টি ২ কোটি ৭০ লক্ষ। মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য সৃষ্টি করার জন্যই 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠন করা হয়।

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, ''বিলেতের সম্মতি পাবার পর কার্জন ও অ্যান্ড্রু ফ্রেজার অবিলম্বে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কার্জন স্বয়ং রচনা করেছিলেন সরকারি আদেশনামা। সেটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই। এর সামান্য কিছু পরেই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।'' (ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব—পৃঃ ১০৭)।

পরের দিনই বিভিন্ন আকারের আন্দোলনে বাংলা বিধ্বস্ত। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী নলিনীকান্ত সরকার সেই সময় আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁর স্মৃতিকথায় (আসা-যাওয়ার মাঝখানে) লিখেছেন এইভাবে— সারা বাংলাদেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠল। এক অভিনব জাতীয় জাগরণ। আমরা পল্লীবাসীরা দেশাত্ববোধের কোনই ধার ধারতাম না। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'-এর কোনও মানে বুঝতে পারতাম না। মাঝে বুঝিয়ে দিলেন একদিন এক মুসলমান বক্তা—মৌলবী দীন মহম্মদ, আর একজন গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানে বুঝিয়ে দেওয়াই নয়—তাঁরা যেন দেশাত্মবোধের ইনজেকশন দিয়ে আমাদের মুমূর্ষু দেহে প্রাণ সঞ্চার করে গেলেন।'' (২০.৭.১৯০৫)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল লর্ড কার্জনের ১৯০৫ সালে বাংলা-ভাগ। কার্জন মুখে শাসনতান্ত্রিক সুবিধের কথা বললেও ব্রিটিশ শাসকেরা বাংলা ভাগ করেছিল মূলত তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে।— (১) বাংলা ও বাঙালি যে বা যারা ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের পীঠস্থান ও পুরোভাগে তাদের সজোরে ধাক্কা দেওয়া; (২) বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া এবং (৩) বাংলার প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভেদ ও অনৈক্য উস্‌কে দিয়ে নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে শাসনকার্যের সুবিধে দেওয়া। তবে কার্জনের এই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে তার জন্য শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হয়।

১৯০৫ সালের ৭ অগস্ট বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা। এতে প্রথম পর্বে নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র-র মত নরমপন্থী নেতাগণ। ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে ঐ দিনই বঙ্গভঙ্গবিরোধী নেতাদের নির্দেশে সমগ্র বাংলা প্রদেশ জুড়ে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। ঐদিন বঙ্গবাসী অনশনে অতিবাহিত করে। কলকাতায় হরতাল পালিত হয়। সাধারণ মানুষের সাথে বাংলায় বিখ্যাত মনীষীরা খালি পায়ে গঙ্গার

ঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে। রবীন্দ্র-রচিত সংগীত গাইতে গাইতে রবীন্দ্রনাথের সাথে নগর পরিক্রমা করে। কলকাতায় পথঘাট 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হয়। একে অন্যেকে রাখি পরান। নাখোদা মসজিদের ইমামের হাতে রাখি বেঁধে দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাখি বেঁধে দেন শিখ গুরু কুয়ায় সিংয়ের হাতে এবং উত্তর কলকাতায় নানা স্থানে বক্তৃতা করেন ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে বিমুগ্ধ হন।

এই দিন অপরাহ্নে এক বিরাট জনতার সামনে প্রবীণ নেতা আনন্দমোহন বসু 'ফেডারেশন হল' বা 'মিলনমন্দির' নামে একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আনন্দমোহন বসু ৫০ হাজার সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

এই দিন রাখি বন্ধনের একটি চিত্র তুলে রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঘরোয়া'য়—"ঠিক হল ওইদিন সকালবেলা সবাই গঙ্গাস্নান করে সবার হাতে সবাই রাখি পরাব। সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব। রবিকাকা বললেন, "সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি-ঘোড়া নয়। ... রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা খই-ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে। মহা ধুমধাম—যেন একটা মহাশোভাযাত্রা। দীনুও (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ছিল সঙ্গে। গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল। হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হল "বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার বায়ু বাংলার ফল/পুণ্য হউক, পুণ্য হউক/হে ভগবান।" ঐদিনেই বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'জাতীয় ভাণ্ডার' গড়ে তোলার জন্য এক ঘণ্টায় ৭০ হাজার টাকা চাঁদা ওঠে।

বিদেশি জিনিস বয়কট না করলে স্বদেশি শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশ হবে না। এই ভাবধারা নিয়ে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন আরম্ভ হল। ভারতজাত দ্রব্য ব্যবস্থায় ও ইংল্যান্ডজাত বিদেশি দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রস্তাব ও সঙ্কল্প গৃহীত হয়েছিল। স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার কেন্দ্রিক এই স্বদেশি আন্দোলন বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করে। এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্বদেশি আন্দোলনের দিনগুলিতে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনও স্বদেশি ভাবনায় আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। কোনও বিবাহ উপলক্ষে যদি এমন কোনও বিদেশজাত দ্রব্য উপহার পাওয়া যেত যার স্বদেশি বিকল্প আছে, তবে সেটি গৃহীত হত না; উপহারদাতাকে তা ফেরত দেওয়া হত। কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠানে দেবার্চনায় উপচারে কোনও বিদেশি দ্রব্য থাকলে পুরোহিতেরা সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে অসম্মত এটাও দেখা যেত। উৎসব অনুষ্ঠানে অতিথি অভ্যাগতগণও খাদ্যবস্তুতে বিলাতি চিনি বা লবণ ব্যবহৃত হলে সেই নিমন্ত্রণ বর্জন করতেন।"

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বদেশি আন্দোলন প্রভাব ফেলেছিল। স্বদেশি ভাবনায় সমৃদ্ধ বহু সাহিত্য ও সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয় ও ন্যাশান্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অরবিন্দ ঘোষ হন অধ্যক্ষ। দেশি শিল্পোদ্যোগকেও শক্তিশালী করে। দেশের মধ্যে বহু কাপড়ের কল, সাবান ও দেশলাই কারখানা, তাঁতযন্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, স্বদেশি ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। নারীরাও এই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে থাকেনি। তাঁরা শোভাযাত্রা ও পিকেটিং-এর কাজে পথে নেমেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বহু স্বদেশ প্রেমিক মুসলমান অংশ

নিয়েছিলেন—যেমন হালিম গজনভি, আবদুল্লা রসুল, দীন মহম্মদ, দীদার বক্স, মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল হোসেন, আবদুল গফুর এবং মৌলবী লিয়াকত হোসেন প্রমুখ। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার মন্তব্য করেন যে এই আন্দোলন মূলত হিন্দু জমিদার ও মধ্যবিত্তদের দ্বারা পরিচালিত। মুসলমানেরা এই আন্দোলনে সেরকমভাবে সামিল হয়নি। তাছাড়া কৃষক, শ্রমিক, অন্ত্যজ, দলিত এবং মদিনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আন্দোলনে লক্ষ করা যায় না। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের অধ্যাপক চিত্রব্রত পালিত সেই বক্তব্যকে বিনম্রভাষায় খণ্ডিত করেন এই বলে— যে সমস্ত শ্রেণি এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি বলে মনে করা হয় তারাও খুব দূরে ছিল না। অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দদাসের নেতৃত্বে কৃষকেরা, অশ্বিনী ব্যানার্জি, প্রভাতকুমার রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা, সরলাদেবীর নেতৃত্বে মহিলারা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ১৯০৫-এর সেপ্টেম্বর কলকাতায় রাজাবাজারে জনাব আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে কলকাতার মুসলিম নাগরিকদের এক সম্মিলন হয়েছিল। সেই সভায় বয়কটের কর্মসূচির প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জানানো হয়েছিল। ১৯০৬ সালে বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনেও রসুল সাহেব সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে প্রস্তাব এনেছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব খাজা অতিবুল্লা।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ১৯০৫-এ ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দশ হাজার ছাত্র নগর পরিক্রমা করে সাম্প্রদায়িক একতার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন।

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক সম্মিলন উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল গিয়েছিলেন। সেখানে পুলিশ লাঠি চালিয়ে প্রাদেশিক সম্মেলন বন্ধ করে দিল; সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেফতার ও জরিমানা করল, এমন কি অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো শ্রদ্ধেয় জনসেবকও নিগ্রহের শিকার হলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল বাখরগঞ্জে, মাদারিপুরে, বিক্রমপুর পরগণায়, মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জে। এইসব জায়গা ছিল শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকঅধ্যুষিত; কিন্তু বেশ কিছু অনুন্নত।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, "১৯০৫-এর স্বদেশি আন্দোলন বাংলার জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন বিশেষ কোনো শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাদেশিকতার এমন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ভারতীয় ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয়নি। ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষে ১৮৮৩ সালে এদেশে যে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়, স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতার সামনে তাও যেন তলিয়ে গেল। ১৯০৫-এর আন্দোলন শুধু কলকাতা বা এমনকি বাংলার শহর মফস্বলেই সীমিত ছিল না, এর ধ্বনি ওপ্রতিধ্বনি পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বে প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি অঞ্চলেও শ্রুত হয়।"

১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সুরেন্দ্রনাথের কাছে বাংলার মানুষের উপর আকস্মিক বজ্রপাত বলে মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—"আমাদের মনে এই ভাব জাগল যে আমাদের অপমান করা হয়েছে, আমাদের অবজ্ঞা করা হয়েছে, লঘু করা হয়েছে, আমাদের সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে। আমরা অনুভব করলাম, আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত হতে চলেছে। আমরা আরও বুঝতে পারলাম যে

আমাদের পর ইচ্ছা করেই এই আঘাত হানা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান ঐক্য ও আত্মসচেতনতা দেখা দিয়েছে, তাকে ধ্বংস করা। গোড়ার দিকে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেশ বিভাগ করার ইচ্ছা থাকলেও আমরা বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের গন্ধ ও মিশ্রণ রয়েছে এবং একে যদি পাশ হতে দেওয়া যায়, তা হলে তা আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে মারাত্মক হবে, আর যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর ভারতের উন্নতি প্রধানত নির্ভর করছে তাকেও মারণ আঘাত হানবে।"

সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি ব্রিটিশের সাথে সরাসরি সংঘাতের পথে না গিয়ে 'নিয়মতান্ত্রিক বৈধ উপায়ে'-এর প্রতিবিধান চেয়েছিলেন। তাই তো ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন, "সুরেন্দ্রনাথের বিচারে বাংলার প্রতি গভীর অবিচারের (বঙ্গভঙ্গ) প্রতি ব্রিটিশ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল বয়কটের অদ্বিতীয় লক্ষ্য, বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাঙালিদের অভিযোগ দূর করলেই বয়কটের প্রয়োজনও ফুরোবে। ... সুরেন্দ্রনাথ ভারতপ্রেমী ইংরেজদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাননি।"

যা হোক, পরিশেষে বলা যেতে পারে একদিকে কংগ্রেসি আন্দোলনের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা, ও অপরদিকে সশস্ত্র বিপ্লববাদের মহড়া—এ দু'য়ের মিলিত ফলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যয় ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা, লর্ড কার্জন যখন উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেছিলেন—"The Partition of Bengal is a settled fact", সুরেন্দ্রনাথ কার্জনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, "I will unsettle the settled fact." সত্যিই বঙ্গভঙ্গ নামের পরিকল্পিত স্থায়ী ঘটনাটিকে নস্যাৎ করতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনও খামতি ছিল না। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লির রাজদরবারে বসে ঘোষণা করলেন বাঙালি জনগণ আবার একসঙ্গে বসবাস করবে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ হল বটে, কলকাতায় রাজনৈতিক গুরুত্ব নষ্ট করে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গেল। বাংলার বুকে কামড় একটা দিলই। কোনো বড় কাজ সম্পাদন করতে গেলে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতেই পারে। আমাদের অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই সামনের সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য। সেদিন যে স্বদেশিক উদ্দীপনার উদ্ভব ঘটে ছিল, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে তা পুনর্জাগরিত হলে দেশ তথা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণ। আমরা সেই শুভ বোধোদয়ের দিকে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষমান।

ঋণস্বীকার :

(১) দৈনিক স্টেট্‌সম্যান (২) বর্তমান রবিবার (৩) আধুনিক ভারত (৪) বঙ্গভঙ্গ— ১৯০৫ (৬) কলকাতা পুরশ্রী (৭) পরিকথা (৮) পরিচয় (৯) সাহিত্য সংস্কৃতি (১০) এ নেশন ইন মেকিং

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক*

গরিফায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপ্তিময় রায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে উত্তরচব্বিশ পরগণার প্রসিদ্ধ জনপদ গরিফার মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান স্বনামখ্যাত লেঃ কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত ও কর্মকৃতিত্ব খুবই উজ্জ্বল। শুধুমাত্র সেকালের এক বিশিষ্ট চিকিৎসক নয়; সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যসাধক রূপেও তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। লেঃ কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত প্রথম বাঙালি আই এম এস।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জামাতাকে নানাবিধ গুণ ও সৎ স্বভাবের জন্য বিশেষ স্নেহ করতেন ও তাঁকে জনহিতকর কাজে উৎসাহ দিতেন। রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্নেল মুখোপাধ্যায় ঐ কলেজের কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্য ছিলেন এবং কলেজটির উন্নয়নের ব্যাপারে সচেষ্ট হতেন। এছাড়া অন্য কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল।

কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত ইংরেজি ভাষায় লেখা কবিতা সেকালের বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাঁর লেখা বই 'A Dying Race' বিশ শতকের প্রথম দশকে বিতর্কিত পুস্তক হিসাবে বিদগ্ধ মহলে আলোড়ন তুলেছিল। দশ খণ্ডে প্রকাশিত 'মহাভারতের সূচি' তাঁর আর এক সাহিত্য কীর্তি।

জানা যায় যে ১৮৮৫-১৮৮৬ সালের কোনও এক সময়ে বিশেষ এক পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ গরিফা রায়পাড়ায় তাঁর জামাতার পৈতৃক বসতবাটিতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর মণিরামপুরের গৃহ থেকে ঘোড়ার গাড়িতে বারাকপুর রেলস্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে করে নৈহাটি স্টেশনে নেমে সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে গরিফায় 'মুখার্জি বাড়িতে' এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন এবং সন্ধ্যায় এভাবেই আবার মণিরামপুর ফিরে যান।

সেদিন গরিফাবাসী ঘরোয় পরিবেশে তাদের প্রিয় জননেতাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে গর্বিত ও আনন্দিত হয়েছিল। কর্মবহুল জীবনে সদাব্যস্ত সুরেন্দ্রনাথ সময়-সুযোগ করে পারিবারিক তথা সাংসারিক কর্তব্যগুলি যেমন সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন তেমনই সাধারণ মানুষদের সঙ্গেও হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপচারিতায় রত হতেন যদিও তাঁর গাম্ভীর্যকে সকলেই সমীহ করত।

পরবর্তীকালে কর্নেল উপন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়ায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি 'আনন্দমঠ' নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে থাকেন। কিন্তু তিনি আজীবন গরিফার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গরিফায় যে বাড়িতে এসেছিলেন সেই বাড়িটি আজও গরিফা রায়পাড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট লেখক

নানা তথ্যে রাষ্ট্রগুরু

কানাইপদ রায়

রাষ্ট্রগুরুর বসতবাড়ি :

চানক-বারাকপুরের পশ্চিমপ্রান্তে প্রাচীন জনপদ মণিরামপুর। চানক আর পলতার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই জনপদকে স্পর্শ করে বয়ে চলেছে হুগলি নদী। এই নদীর উপরেই রাষ্ট্রগুরুর প্রাসাদোপম বাড়ি। কলকাতার তালতলায় জন্মগ্রহণ করলেন ১৮৮০ সাল থেকে ১৯২৫ সালের ৬ অগস্ট আমৃত্যু মণিরামপুরের বাড়িতে বসবাস করেছেন। রাষ্ট্রগুরুর পিতা ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। বাড়িতে ঢুকতেই দোতলা বাড়ির নীচে গাড়ি রাখার খোলামেলা জায়গা। বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একসময় ছিল চওড়া দরজা। রাষ্ট্রগুরু ঘোড়ার গাড়ি চেপে সেই দরজা দিয়ে ঢুকতেন।

মণিরামপুরে রাষ্ট্রগুরুর বসতবাড়ির জমির পরিমান ৭ বিঘা, ২ কাঠা, ১৩ ছটাক। জমির মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু গাছ আর একটি পুকুর। শোনা যায় এলাকার মেয়েরা গোরাদের ভয়ে সেসময় গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যেতে পারতেন না, সে কারণেই রাষ্ট্রগুরু তাঁর বাড়ির সংলগ্ন পুকুরটি খনন করে দেন। লোকমুখে এই বাড়িটি একসময় সিভিল ডিফেন্স-এর বাড়ি বলেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিভিল ডিফেন্সের অফিস ছিল এই বাড়িটিতে। সরকার থেকে এই বাড়িটি সম্প্রতি মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়কে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। এখন সেখানে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস ছাড়াও গড়ে উঠেছে নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজের উদ্যোগে একটি মিউজিয়ামও গড়ে তোলা হয়েছে। রাষ্ট্রগুরুর ব্যবহৃত চেয়ারটি এই মিউজিয়ামে রক্ষিত রয়েছে। বাড়ির একেবারে পশ্চিমে গঙ্গার তীর ঘেষে রাষ্ট্রগুরুর চিতাভষ্মের উপর নির্মিত হয়েছে স্মৃতিফলক।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দ উনিশ শতকের শেষের দিকে মণিরামপুরে এসেছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন— "বৈদিক শিক্ষার অনুকূলে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার আন্দোলন করিবার জন্য মণিরামপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি যাই। সুরেনবাবু সে সময়ে তাঁহার বাড়ির সম্মুখেই গঙ্গার ধারে রাস্তার উপরে পায়চারি করিতেছিলেন। সদর দরজায় একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ভ্রমণ শেষ করিয়া সুরেনবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমার নিঃশ্বাস ফেলবারও আবকাশ নেই। আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।" অল্পক্ষণ পরেই চোগা-চাপকান পরিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দ মঠের?"

আমি বলিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী, তাই আপনাকে দেখতে এলাম।" সুরেনবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, একটু একটু চেষ্টা করি।" আমি বলিলাম "আলমবাজার

মঠে আমরা একটি বৈদিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আপনার 'বেঙ্গলী' কাগজে এ বিষয়ে আপনি একটু আন্দোলন করলে বড় ভাল হয়, সেই অনুরোধ করতেই আমি এসেছি।'' সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি এখন কোথায় যাবেন?'' আমি বলিলাম, ''ভাটপাড়ায় পণ্ডিত মশায়দের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।'' তিনি বলিলেন, ''এ তো অতি উত্তম কথা। আমি অবশ্যই এব অনুকূলে আন্দোলন করব।'' কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি এক-ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া বাড়ির সামনে দাঁড়াইল। গাড়ি দেখিয়া আমার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ''আমি বারাকপুর স্টেশন যাব, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, পথে আপনাকে নামিয়া দিয়ে যাব।'' গাড়িতে উঠিতেই তিনি আমাকে তাঁহার পাশে বসাইলেন। যাইতে যাইতে অনেক কথাই হইল।'' (স্মৃতিকথা, স্বামী অখণ্ডানন্দ)

এই বাড়িটি একবার ভূমিকম্পে সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। রাষ্ট্রগুরু 'এ নেশান ইন মেকিং' গ্রন্থে সে কথা লিখেছেন— ''১২ জুন নাগাদ বম্বেতে ফিরে এসে জানতে পারলাম বাংলায় এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে, অনেকে মারা গেছে, সম্পত্তিও নষ্ট হয়েছে প্রচুর। উত্তরবঙ্গে বেশি ক্ষতি হয়েছে। নাটোরে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন চলছিল তা ভেঙে গেল। আমি হাওড়ায় না নেমে শ্রীরামপুরে নামলাম। সেখানে আমার বন্ধুরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভূমিকম্পের কথা শুনে বাড়ির লোকেদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। শ্রীরামপুরের নদী পেরিয়ে বারাকপুরের বাড়িতে এলাম। ভূমিকম্পের সময়টা ছিল মহরমের সময়। আমার সন্তানেরা মহরমের খেলা দেখতে বাইরে ছিল। তারা ছিল খোলা জায়গায়। গাড়ি ও ঘোড়া কম্পনের ফলে দুলে উঠেছিল। বাড়িতে আমার স্ত্রী ছিলেন একা। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাগানে চলে এসেছিলেন। বাড়িতে বড় ক্ষতি না হলেও ফাটল দেখা গিয়েছিল।''

বারাকপুরের ঋষি :

মহাত্মা গান্ধী দু'বার এই বাড়িতে এসেছেন। প্রথমবার আসেন অসুস্থ রাষ্ট্রগুরুকে দেখতে ১৯২৫ সালের ৬ মে। ফিরে যাবার পরে তাঁর সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় রাষ্ট্রগুরুকে 'বারাকপুরের ঋষি' আখ্যা দিয়ে তিনি লেখেন— ''স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। শুনেছিলাম, তিনি অসুস্থ এবং বার্ধক্য তাঁর ইস্পাত কঠিন দেহাবয়বে বার্ধক্যের ছাপ ফেলেছে। সেকারণে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমার কিছু কার্যকলাপ মেনে নিতে পারেননি, তবু আধুনিক বাংলার রূপকার এবং ভারতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা কমেনি। আমার মনে পড়ছে, এক সময় শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁর মুখে ভাষা পেত। তাই বারাকপুরের তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। গঙ্গার তীরে সুন্দর পরিবেশে স্যার সুরেন্দ্রনাথের একটা সুন্দর অট্টালিকা আছে। চারিদিক শান্ত। জনাকীর্ণ কলকাতা থেকে পরিশ্রমের পর কেন তিনি এখানে ফিরে এসে পরিতৃপ্তি লাভ করতেন, তা সহজেই অনুমেয়। আমি ভেবেছিলাম তিনি দুর্বল হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, আর সেবা-যত্ন নিচ্ছেন। বরং উল্টোটাই দেখলাম। একজন মানুষ সটান মেরুদণ্ড নিয়ে আসন ছেড়ে পরম আন্তরিকতায় আমাকে আপ্যায়ন করলেন এবং তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, তাঁর স্মৃতি আগের মত আজও তরতাজা।

ছোটবেলার কথা এখনও তিনি মনে করতে পারেন। তাঁর স্মৃতিকথা সবেমাত্র বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে। গত ৯ বছর ধরে এই বইটা তিনি লিখেছেন। বেশ গর্বের সঙ্গে তিনি তাঁর সুন্দর পাণ্ডুলিপিটি দেখালেন। পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পাতা অকম্পিত কলমে বলিষ্ঠ হাতে রীতিসিদ্ধভাবে লেখা। এখন তাঁর বয়স ৭৭। কিন্তু পণ্ডিত মালব্যজির মতো তাঁর আত্মবিশ্বাস। তিনি জানালেন, "আমি ৯১ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকব এবং তখনও আজকের মতই প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকব।" বর্তমানে কি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন— তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন, তিনি স্মৃতিকথা বইটির সংস্করণের কাজে ব্যস্ত। কেননা, এবছরই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে। চারপাশের সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রাণবন্ত আগ্রহ। বাংলা থেকে ফিরে যাওয়ার আগে আরও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব, এই অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "বারাকপুরে আসার সময় না পেলে আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব"। "আমি আপনাকে সেরকম কষ্ট দিতে চাই না। আমি অবশ্যই সময় করে আসব," আমি বললাম।

নিয়মিত অভ্যাসে অনড় থাকাই ছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথের প্রাণশক্তির চাবিকাঠি। কোন বাধা তাঁকে কলকাতায় রাত কাটাতে বাধ্য করতে পারেনি। বারাকপুরের বাড়িতে ফিরে আসার জন্য শেষ ট্রেন ধরতে কখনও ব্যর্থ হননি। তিনি হয়তো বলবেন, এই নিয়মানুবর্তিতা ভারতবর্ষ সেবার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজে অপরিহার্য।"

ইয়ং ইন্ডিয়া ১৪ মে, ১৯২৫—ভাষান্তর : কানাইপদ রায়

বাংলার সিংহ :

রাষ্ট্রগুরু ১৯২৫ সালের ৬ অগস্ট দেহরক্ষা করেন, তার পরদিন গান্ধীজি বারাক পুরের বাসভবনে দ্বিতীয়বার আসেন। কারণ তিনি রাষ্ট্রগুরুকে আবার আসবেন বলে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন। এইবারে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন দীনবন্ধু চার্লি এন্ড্রুজ। গান্ধীজি ফিরে গিয়ে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথকে 'বাংলার সিংহ' আখ্যা দিয়ে লিখলেন— "স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মৃত্যু এমন একজন মানুষকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল যাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর কাছ থেকে কি নতুন নতুন আদর্শ ও আশার বাণী এক সময়ে আমরা পাইনি, যদিও বর্তমান সময়ে হয়তো তিনি একটু পশ্চাৎ সারিতে চলে গেছেন? আমাদের বর্তমান আমাদের অতীতেরই ফল। বর্তমান কালের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা হয়ত সম্ভবই হত না যদি স্যার সুরেন্দ্রের মত পথিকৃৎরা অমূল্য কার্য সম্পন্ন না করে যেতেন। একটি সময় ছিল যখন ছাত্রজগৎ তাঁকে পূজা করত, যখন তাঁর উপদেশ যে কোন জাতীয় বিচার-বিবেচনায় অপরিহার্য বলে গণ্য হত, এবং যাঁর বাগ্মিতা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। 'বঙ্গভঙ্গ'-এর সময়কালের প্রবল আলেনাড়নকারী ঘটনাগুলিকে স্মরণ করাই যাবে না যদি আমরা স্যার সুরেন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে তুলনাহীন সেবার কথা মনে না করতে পারি। এই কারণেই কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'সারেন্ডার-নট' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। 'বিভাজনের' অত্যন্ত নিরাশার সময়েও স্যার সুরেন্দ্রনাথ অটল ছিলেন এবং কোনও সময়ে হতাশ হননি। তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তিনি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রবল আগ্রহ সারা বাংলাকে সংক্রামিত করেছিল। 'নিশ্চিত ঘটনা'কে অনিশ্চিত করার বিষয়ে তাঁর দৃঢ়তা ছিল অনমনীয়। তাঁর কাছ থেকে সাহস ও দৃঢ়

সংকল্পের শিক্ষা আমরা পেয়েছি। শাসককে ভয় না করার শিক্ষাও তিনি আমাদের দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কাজ রাজনৈতিক বিষয় থেকে কম মূল্যবান ছিল না। রিপন কলেজের মাধ্যমে হাজার হাজার ছাত্রকে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তারা উদার শিক্ষা লাভ করেছিল। তাঁর নিয়মিত অভ্যাস তাঁকে স্বাস্থ্য, বল এবং বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের জন্য দীর্ঘ আয়ু দান করেছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মানসিক বৃত্তিগুলি অটুট ছিল। সাতাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর নিজের কাগজ 'বেঙ্গলী' সম্পাদনার দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করা কম সাহসের পরিচয় ছিল না। তাঁর মানসিক শক্তি ও শারীরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের আস্থা এতটাই ছিল যে, দু'মাস পূর্বে আমি যখন তাঁর সঙ্গে বারাকপুরে সাক্ষাৎ করি তখন একানব্বই বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার কথা আমাকে বলেছিলেন। তার পরে আর বাঁচতে চাননি, কারণ তারপরে হয়তো মানসিক সক্ষমতা অতটা আর থাকবে না। কিন্তু ভাগ্য অন্যরকম ব্যবস্থা করল। সতর্ক না করেই আমাদের কাছ থেকে ওঁকে ছিনিয়ে নিল। কারণ বৃহস্পতিবার ৬ অগস্ট সকালবেলা কেউ ধারণা করতে পারেনি যে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হবে। মৃত্যুর কোন লক্ষণই ছিল না। তবে, যদিও শারীরিকভাবে উনি আমাদের মধ্যে নেই, তাঁর দেশের প্রতি কর্তব্য ও সেবা কেউ কোনদিন ভুলবে না। আধুনিক ভারত গড়ার একজন কারিগর হিসাবে তাঁকে আমরা চিরকাল মনে রাখব।"

ইয়ং ইন্ডিয়া ১৩ অগস্ট, ১৯২৫—ভাষান্তর : সুপ্রিয় মুন্সী

পুরপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রগুরু :

দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি উত্তর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান ছিলেন। তিনিই প্রথম নির্বাচিত পুরপ্রধান। উত্তর বারাকপুর পুরসভা গঠিত হয় ১৮৬৭ সালে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল গারুলিয়া। পরবর্তীকালে ১৮৯৬ সালে গারুলিয়া পৃথক পুরসভা হিসাবে পরিগণিত হয়। সেসময় এই পুরসভার আয়তন ছিল সাড়ে পাঁচ বর্গমাইল এবং দশটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল— নোয়াপাড়া, ইছাপুর (দুটি ওয়ার্ড), নবাবগঞ্জ (তিনটি ওয়ার্ড), পলতা, ধিতারা, মণিরামপুর এবং গাঁতি। বর্তমানে এই পুরসভার আয়তন ১২.২২ বর্গকিমি এবং মোট ওয়ার্ড ২২টি। প্রথম পুরপ্রধান ছিলেন— ক্যাপ্টেন এন হপকিনসন। তারপর পুরপ্রধান হন, ক্যাপ্টেন জে এফ রেভেট। ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ঐ সালের ১ অগস্ট পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন মেজর ডব্লু আর ব্রাইট। ২ অগস্ট ১৮৮২ থেকে ৪ এপ্রিল ১৮৮৩ পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন মেজর এইচ সি ক্রিক। ৫ এপ্রিল ১৮৮৩ থেকে ২০ জানুয়ারি ১৮৮৫ পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন মেজর ডব্লু হপকিনসন। এরপর ২১ জানুয়ারি ১৮৮৫ থেকে তিনি পুরপ্রধানের ভার গ্রহণ করেন। প্রথমে একটানা ১ মে ১৮৮৯ পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন। তারপর ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ থেকে ১৫ অক্টোবর ১৯২১ পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন। তাঁর পুত্র ভবশঙ্কর ব্যানার্জি ৫ জুন ১৯২২ থেকে ৩ নভেম্বর ১৯৩৪ পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন।

স্বাস্থ্য সচেতনতা :

স্বাস্থ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু ছিলেন খুবই সচেতন। জানা যায় সুরেন্দ্রনাথ নিয়মিত মণিরামপুরের বাড়ি থেকে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থ থেকে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ের মনোভাব জানা যায়। তিনি লিখেছেন— "আমার ভাল স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন লাভের

গোপন রহস্যবিষয়ে আমার বন্ধুরা আমাকে লিখতে পরামর্শ দিয়েছে। ৭৫ বৎসর পূর্ণ করতে চলেছি। আজও সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করছি এবং মানসিক দিক দিয়েও তরতাজা। বন্ধুরা বলে, আমার অভিজ্ঞতা তাঁদের কাজে লাগবে।

সারা জীবন এই নীতিটি অনুসরণ করে আসছি যে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল স্বাস্থ্য রক্ষা করা। অন্য সবকিছু এর উপর নির্ভরশীল। যন্ত্র থেকে কাজ পেতে হলে তাকে উপযোগী করে রাখতে হবে। সেরা মানুষদের মধ্যে কয়েকজনকে বাদ দিলে প্রায় সকলেই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পরলোকগমন করেছেন। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, কেষ্টদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ এবং আরও অনেকে তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময়ে পরলোকগমন করেছেন। তাঁরা যেন সেই ল্যাটিন প্রবাদের দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন— ভগবান যাঁদের ভালবাসেন তাঁরা অল্পবয়সেই পরলোকগমন করেন— Those whom the gods love die young তাঁরা দীর্ঘায়ু লাভ করে তাঁদের পরিণত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশবাসীকে পথনির্দেশ দিয়ে পরিচালিত করলে কতই না লাভ হত।

আমার মতে স্বাস্থ্য ভাল রাখার প্রয়োজনীয় শর্ত হল— প্রত্যহ ব্যায়াম করা। তবে ব্যায়াম করতে হবে পরিমিত এবং মনে উৎফুল্লের ভাব আসলেই তা বন্ধ করতে হবে। অতিরিক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। নিয়মিত ব্যায়ামে শরীরের গঠন পেশীর স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আমি সারা জীবন এবং এখনও সকালে খালি পেটে আধ ঘণ্টা এবং বিকেলে চা পান করার পর ৪০ মিনিট ব্যায়াম করি। বিকেলে সভাসমিতি এসবের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে না পারলেও রাত্রিতে খাওয়ার পূর্বে তা সেরে নিই। আমার মতে হাঁটাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। যৌবনে হাঁটার সঙ্গে ডাম্বেল ও মুগুর নিয়েও ব্যায়াম করতাম। ভারতীয় প্রথা হল সকালে খাবার পূর্বে ব্যায়াম করা। ... এই ব্যায়ামের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংযত জীবনযাপনও প্রয়োজন। ... আমি যথাসম্ভব সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও ভোজ পরিহার করেছি— এটি আমার জীবনের ব্রত। আমি বালক বয়সে টডের 'স্টুডেন্টস গাইড' বইটি পড়েছি এবং যে উপদেশটি অনুশীলন করতে চেষ্টা করেছি তা হল— সকাল সকাল ঘুমান এবং সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ। ...

একবার রাউলাট বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভায় আলোচনা চলাকালীন ডিনারের সময় লর্ড চেমসফোর্ড সভার কাজ স্থগিত রেখে দেড় ঘণ্টা পর সবাইকে পুনরায় মিলিত হতে নির্দেশ দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মাই লর্ড, রাত নটায় আমি শয্যা গ্রহণ করি।' সদাপ্রফুল্ল লর্ড চেমসফোর্ড বললেন, 'আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হল, মিস্টার ব্যানার্জি' ... সারাজীবন আমি এই নিয়ম মেনে চলেছি। আজও আমি যে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী এটাই তার প্রধান কারণ।

অত্যধিক মস্তিস্কের কাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এ কথা আমি মনে করি না। তবে মস্তিস্ক চালানোর বিষয়টি নিজের রুচি অনুযায়ী হওয়া দরকার এবং তা যেন ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়। তাহলে এটি টনিকের মতো কাজ করে এবং শরীরের ক্লান্তি দূর করে স্নায়ুকে সতেজ করে। ভাল স্বাস্থ্যের জন্য ধূমপান এবং উত্তেজক পানীয় বর্জন করার কথা বলা হয়। আমি সারাজীবন এ দু'টোই এড়িয়ে এসেছি। যারা ধূমপান এবং সুরাপান করেন তাদের চেয়ে আমি কম আনন্দ উপভোগ করছি, তা নয়। এসব সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু তাদের অল্প মাত্রায় গ্রহণ করলেও শরীরের পক্ষে

সেসব অপরিহার্য নয় বা স্বাস্থ্যের অঘটন ঘটাবার ঝুঁকি থেকেও মুক্ত নয়। জলবায়ু এবং গোষ্ঠীগত রুচি অনুযায়ী মানুষের কাছে খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পুরুষানুক্রমে প্রত্যেক জাতির কাছে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, কোন খাদ্য তাদের কাছে ভাল বা মন্দ। অবশ্য স্থান কাল ভেদে তা পরিবর্তিত হয়। ইউরোপীয়রা মাংসাশী আবার ভারতয়ীরা নিরামিষাশী... আমার অভিজ্ঞতায় একটি বিষয় স্পষ্ট এবং তা হল বয়সের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলাই শ্রেয়। ...ল্যাটিন কবির সেই কথা— সুস্থ দেহে সুস্থ মন— *mens sana in corpore sano*— তাঁর সময়ে যেমন ছিল, আজও ঠিক তাই রয়েছে।" *'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থ থেকে ভাষান্তর— কানাইপদ রায়*

বারাকপুরে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড বিষয়ে রাষ্ট্রগুরুর ভূমিকা :

বারাকপুরে ডা. সুরেশচন্দ্র সরকারের হত্যাকণ্ডে দোষীদের শাস্তি দানের ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা মনে রাখার মতো। এই ঘটনায় 'এ নেশান ইন মেকিং' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন— "১৮৯৮ সাল একটা দুঃখের ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকল। এই ঘটনাটি ভারতীয় সমাজে বিশেষভাবে বাংলায় একটা চেতনা জাগ্রত করেছিল। যে দুঃখের ঘটনাটি আমি উল্লেখ করছি তা হল— বারাকপুরের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকারের হত্যাকাণ্ড। সুরেশচন্দ্র সরকারের ভাল পসার ছিল। চিকিৎসায় ছিল তাঁর নৈপুণ্য। রোগীদের প্রতিও ছিল তাঁর মধুর ব্যবহার। কিছু ইউরোপীয় রোগীও তাঁর কাছে আসতেন। তাঁরাও তাঁর নৈপুণ্য স্বীকার করতেন। বারাকপুর স্টেশনের কাছেই ছিল তাঁর ডিস্পেন্সারি। ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসের এক রাত্রে যখন তিনি বাড়ি ফিরতে উদ্যত, তিন জন ইউরোপীয় সৈন্য মদ্যপ অবস্থায় তাঁর ডিস্পেন্সারিতে প্রবেশ করে। ডাক্তারের গাড়ি প্রস্তুত রওনা দেবার জন্য। সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর কিছু কথা কাটাকাটি হলে ইউরোপীয় সৈন্যগুলো তাঁকে পশুর মত আক্রমণ করল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এবং সেখানেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি মারা যান।

হত্যাকারীরা আক্রমণ করার পরেই দৌড়ে পালাতে থাকে, কিন্তু ডাক্তারের আর্তনাদ ও চিৎকার শুনে উপস্থিত লোকজন তাঁদের পিছনে ধরবার জন্য ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের নেশার উত্তেজনাটা কমে আসে। ডাক্তার রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি যেতে থাকে। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কয়েকজন সৈন্যদের তাড়া করলেন। দু'জন সৈন্য ব্যারাকের মধ্যে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু যাবার সময় একটা হেলমেট ফেলে রেখে যায়। যাঁরা তাড়া করেছিলেন তাঁরা হেলমেটটি কুড়িয়ে নেন। তৃতীয় সৈন্যটি একটি মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নেয়। মসজিদটি তৎক্ষণাৎ বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তাঁরা লোকটাকে মসজিদের মধ্যেই হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

ডাক্তার আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। পারিবারিক চিকিৎসক ছাড়াও আমার প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এই ঘটনা শুনে আমি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হলাম। আমার বাড়ির কাছে হাসপাতালে তাঁকে আনা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে দেখতে না যেয়ে আমি হত্যাকারীদের যথাযথ বিচারের জন্য ১৬ মাইল দূরে আলিপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে-ছুটলাম যাতে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা যায়। এই ধরনের ঘটনায় ইউরোপীয় জুরিদের মেজাজের উপর লক্ষ্য রেখে মামলার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হয়।

মিস্টার চার্লস্ অ্যালিন ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সেরকম সুযোগ পেলে চাকরির সর্বোচ্চ পদে বসতে পারতেন। তিনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। সেটেলমেন্টের কাজে চট্টগ্রামে আমাদের পরিচয় ঘটে। কবি নবীনচন্দ্র সেন যিনি চট্টগ্রামের মানুষ ছিলেন তাঁকে ভাল চিনতেন। তিনিও জানিয়েছিলেন চার্লস্ অ্যালিন একদিন লেফটান্যাণ্ট গভর্নর হবেন। বারাকপুরের বাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন মিস্টার অ্যালিন। একজন ভারতবাসীর প্রতি এরকম সম্মান তখনকার দিনে দুর্লভ। জনস্বার্থ বিষয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এই ঘটনার বিষয়ে আমিই তাঁকে প্রথম জানাই। এর আগে তিনি কোনও খবর পাননি। কেননা ডাক্তার তখনও পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই ঘটনার বিবরণ তাঁকে আমি দিলাম। তিনিও আমার মনের অবস্থার অংশীদার হলেন এবং আশ্বাস দিলেন ন্যায়বিচারের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। সরকারি উকিল বাবু আশুতোষ বিশ্বাস সে সময়ে খুব নামকরা উকিল ছিলেন। আমি এই মামলায় তাঁকেই ভার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। মিস্টার অ্যালেন আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন। আশুতোষ বিশ্বাসকে নির্দেশ দেওয়া হল এবং সেইমতো তিনি বারাকপুরে এসে মামলা তদারক করতে লাগলেন।

আমি এখানেই থেমে থাকিনি। লন্ডনে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া' পত্রিকায় তার করে খবর পাঠালাম। সেখানকার সংসদেও বিষয়টি উত্থাপিত হল। আমি লেফটান্যাণ্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্নের সঙ্গে দেখা করে মামলাটির বিষয়ে বললাম। তিনিও এই অপরাধের ঘৃণা প্রকাশ করলেন এবং মহামান্য ভাইসরয় (লর্ড এলগিন) যে এই ঘটনায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন তা জানালেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম সেক্রেটারি অব্ স্টেট-এর কাছ থেকে একটা বার্তা এসেছে সংসদে প্রশ্ন ওঠার ফলে।

হাইকোর্ট সেশনে মামলাটি স্থানান্তিরিত হয়। পিউনি (Puisne) জজ মিস্টার জাস্টিস জেনকিন্স, যিনি সাধারণ ফৌজদারি মামলা গ্রহণ করেন কিন্তু এই মামলাটির ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রন্সিস ম্যাকলিন স্পেশাল জুরি নিলেন। এই জুরিদের মধ্যে ইউরোপীয়রাই ছিল বেশি। অভিযুক্তকারীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল সেগুলি হল—হত্যা, হত্যার চেষ্টা, গুরুতর রূপে আহত করা। জুরিরা অন্য সব অভিযোগগুলি রেহাই দিয়ে গুরুতর রূপে আঘাত করা এই অভিযোগে আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করে। প্রধান বিচারপতির মনোভাব যে কি ছিল তা এই সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায়। আইনে যে কঠোরতম শাস্তির বিধান আছে সেই শাস্তিই তিনি আসামীদের দিয়েছিলেন।

পার্লামেন্টের সদস্য মিস্টার ডব্লু এস কাইনে এই মামলার উপর মন্তব্য করে বলেছিলেন তিনজন অভিযুক্তকেই বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।"

শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ :

সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন রাজনৈতিক কাজকে বড় করে দেখলেও শিক্ষকের কাজই তাঁর কাছে বেশি আনন্দদায়ক। বিদ্যাসাগরের অনুরোধ তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে অধ্যপকরূপে কাজ করেছেন। একই সঙ্গে সিটি স্কুলেও পড়াতেন। বিদ্যাসাগর ১০০ টাকা মাইনে বাড়িয়ে সিটি স্কুল ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দিলে রাষ্ট্রগুরু তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৮০ সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর ফ্রিচার্চ স্কুলে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করার পর যোগ দেন প্রেসিডেন্সি

ইনস্টিটিউশনে। এই স্কুলটির পরে নাম হয় রিপন কলেজ—বর্তমান কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। প্রায় ৩৭ বছর তিনি শিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। শিক্ষকতার কাজ তিনি ত্যাগ করেছেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। তাঁর কাছে শিক্ষকতার কাজ ছিল এক পবিত্র কাজ। শিক্ষকের সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত বলে তিনি মনে করতেন। তবে শিক্ষকতার কাজ ও রাজনৈতিক কাজ যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত একথাও তিনি বলেছেন।

সাংবাদিক সুরেন্দ্রনাথ :

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "রাজনৈতিক কাজের জন্য একটা মুখপত্র থাকা দরকার। 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' সারা ভারতে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র ছিল। এটি জনগণ ও সরকারকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি স্বাধীনভাবে পত্রিকা প্রকাশ করার কিংবা পূর্ব-প্রকাশিত কোনও পত্রিকায় যোগদানের কথা ভাবলাম।" সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে দ্বিতীয় ভাবনাটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাংবাদিকতা শুরু হরিশ মুখার্জির 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রিকার মধ্য দিয়ে। হরিশ মুখার্জির মৃত্যুর পর কৃষ্টদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট্'-এর সম্পাদক হন। ১৮৭৪-৭৫-এ ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সুরেন্দ্রনাথ 'হিন্দু পেট্রিয়ট'র লন্ডনস্থ সংবাদদাতা রূপে কাজ করেছেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট্' তখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসাবে কাজ করত। 'পেট্রিয়ট'-এর প্রতিনিধি হয়ে সুরেন্দ্রনাথ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সম্মেলনে যোগ দিয়ে একটি প্রেস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য অনুরোধ করেন। কোনও ফল হয়নি। বরং ১৮৭৮ সালে ১৪ মার্চ দেশীয় সংবাদপত্র আইন বাস্তবায়িত করা হয়। এর প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু করেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় জনসভা করে দেশীয় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে পার্লামেন্টে স্মারকলিপি পাঠান। মিঃ গ্লাডস্টোন, যিনি ছিলেন বিরোধী দলের নেতা, ১৮৭৮ সালে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে বিষয়টি নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ জানান। পরবর্তীকালে গ্লাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হয়ে লর্ড রিপনকে ভারতবর্ষে ভাইসরয় করে পাঠালে রিপন ১৮৮২ সালের ৭ ডিসেম্বর দেশীয় সংবাদপত্র আইনটি রদ করে দেন। সুরেন্দ্রনাথ দেশীয় সংবাদপত্র আইন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হন এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে আন্দোলনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

১৮৭৯ সালের ১ জানুয়ারি সুরেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তালতলার বাড়িতে 'বেঙ্গলী' ছাপা হত, প্রকাশিত হত প্রতি শনিবার। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। গ্রাহক সংখ্যা কমে আসলে তাঁর পক্ষে পত্রিকা চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন হাইকোর্টের সলিসিটর রামনাথ লাহার মাধ্যমে বেচারাম চ্যাটার্জির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটে। সুরেন্দ্রনাথ লৌকিকতার খাতিরে দশ টাকা প্রদান করে এই ইংরেজি সাপ্তাহিকের স্বত্ব কিনে নেন। বেচারাম চ্যাটার্জি অবশ্য কোন অর্থের দাবি করেননি। রামনাথ লাহা পত্রিকা কেনার ব্যাপারটিকে আইনসিদ্ধ করার জন্য কিছু টাকা নেওয়া প্রয়োজন বলে জানালে বেচারামবাবু

সেই টাকা গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্ধুর কাছ থেকে ৭০০ টাকা ধার করে ১৬০০ টাকায় প্রেস কিনে নেন। পত্রিকার খরচ বহনের জন্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে 'বেঙ্গলী'কে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে হেড মাস্টার একবার কথা প্রসঙ্গে বলেন, "৭ দিন ধরে তিনি 'বেঙ্গলী' পড়েন। কিন্তু 'বেঙ্গলী' যদি দৈনিক হয় তাহলে যে তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।" বঙ্গভঙ্গের সময় 'বেঙ্গলী' দায়িত্ববোধের অসামান্য পরিচয় দিয়েছিল। ইংরেজদের তাঁদের ভাষায় আক্রমণ করার সাহস দেখিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সরকারি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় মত পোষণ করে রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলেন। 'দি ইন্ডিয়ান প্রেস'-এ লেখা হয় : "Indian opinion found expression in the columns of the *Bengalee,* edited by the talented Surendranath Banerjea, who is remembered for, amongst other things, his vigorous campaign against the partition of Bengal."

'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ একবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৮৩ সালে ২ মে তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস একটি মামলায় এক পক্ষকে পারিবারিক গৃহদেবতা আদালতে আনতে আদেশ দিলে তিনি তাঁর পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে সম্পাদকীয়তে লেখেন যে বিচারক মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় তার সম্পর্কে আমরা কি ভাবতে পারি? এর পরিণামে হাইকোর্ট সুরেন্দ্রনাথকে ২ মে কারণ দর্শানোর আদেশ জারি করেন। হাইকোর্ট সুরেন্দ্রনাথকে ৫ মে আদালত অবমাননার দায়ে ২ মাস কারাদণ্ডের দণ্ডিত করেন।

সাংবাদিক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ যে কত জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায় যখন কারাবাস হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত ও কবিতা রচিত হয়—

রূপচাঁদ পক্ষীর গীত— ১ জৈষ্ঠ ১২৯০, সোমপ্রকাশ

(সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস হিসাবে রচিত মৃত গোবিন্দ অধিকারীর নিম্নলিখিত গানের সুরে সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছে।)

লিখিতে শিখিতে দিলে কই।
জন্মাবধি নিরবধি জানি না শ্রীরাধাবই।।
রাগিনী : জঙ্গলা, তাল জং।
সুরেন্দ্রনাথ, অনাথের নাথ মহাশয়
ধর্ম্মলাগি, অনুরাগি, মহাতেজি দিগ্বিজয়।।
করিতে ধর্ম্মের হিত ইচ্ছা তাঁর যথোচিত,
হিতে হল বিপরীত মনোদুখ কব কায়।।
সরে না বাক হলাম অবাক।
আফসোসে প্রাণ ফেটে যায়।
ধর্ম্মে অনুরাগ যাঁর তাঁর হরেলা কারাগার
সদর্ম্মী সব দুরাচার ষড়যন্ত্রে রত হয়।।

দেবলোকে রাজা ইন্দ্র নরলোকের সুরেন্দ্র বন্দ্যো
বিদ্যার প্রভাব চন্দ্র ইন্দ্রিয়দোষ মাত্র নাই।
সত্যবাদী গুণনিধি মূলেতে মাৎসর্য্য নাই
বালক পালক, বালক শিক্ষক, যুবা বালকের রক্ষক
আজন্ম কুকর্ম্মে নাহি সক লেখক পাঠক দয়াময়
..................................."

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস উপলক্ষে যে কবিতাটি রচিত হয়, তা 'সোমপ্রকাশ'এ প্রকাশিত হয়— সুরেন্দ্রনাথ স্মরণে ৮ জৈষ্ঠ ১২৯০

"কি শুনিরে আজ হৃদি ফেলে যায়।
এ দুঃখের কথা বলিব রে কায়।।
ভারতের মাঝে সুরেন্দ্র সমান।
সুরেন্দ্রের আজ কারাগারে স্থান।।
মুখেতে বানী যে সরে না আর।

আমি নিজ মুখে ভারতের তরে।
ধরম কৃপণ লয়ে নিজ করে।
অন্যায়ের সহ করিতে সময়।।
যেজন ভারতের নত নিরন্তর।
আজি রে আঘাত হৃদয়ে তাঁর।

কাঁদ বঙ্গবাসী কাঁদ রে বেহারী।
ফেল রে মাদ্রাজী নয়নের বারি।।
কোথায় বোম্বাই পশ্চিম অঞ্চল।
ফেলরে সকলে নয়নের জল।।
দেখা রে তোদের হৃদয় খালি।

কি বিষাদ শরে বিঁধেছে অন্তর।
সুরেন্দ্রের হেন শুনি হতাদর।।
জষ্টিস নরিস ভাবি হত মান।
কারাগারে দেখি মোদের পরাণ।
কি দুঃখ অনল দিয়াছে জ্বলি।

আর একবার ন্যায়ের কারণ।
শ্রী শ্রী নন্দকুমার দিয়াছে জীবন।।
সুরেন্দ্রের দশা দেখিয়া নয়নে।
সেই সব কথা পড়ে গেল মনে।

জ্বলিল দ্বিগুণ হৃদয় জ্বালা।

সাহস উৎসাহ ত্যজিল অন্তর।
ধ্যের্য-গুণ আজ হলো-রে অন্তর।।
সুরেন্দ্রের তরে কাঁদে রে যুবক।
জরাজীর্ণ কাঁদে কাঁদে রে বালক।
কাঁদে রে ভারত অবলা বালা?
...." — *শ্রী দ্বারকনাথ ধর*

১৯০০ সালে 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এটি দৈনিকে পরিবর্তিত করার প্রস্তাব এর আগে অনেক বার করা হলেও জনগণের সেবায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার দিন শেষ হয়ে আসছে। নাগরিক জীবন প্রসার লাভ করছে। দ্রুত সংবাদ পাবার দাবি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা, প্রভাব ও সমর্থন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। পরিস্থিতির চাপে এবং মানিয়ে নেবার নীতি অনুসরণ করে আমাকে চলতে হবে।" ভারতীয় দৈনিকগুলির মধ্যে ব্রিটিশ সংস্থা রয়টারের প্রথম গ্রাহক হয় 'বেঙ্গলী'।

সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালে জুন মাসে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে লন্ডনে যান। এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছাড়া ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথ ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। 'দি টাইমস' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মিঃ লোভাট ফ্রেসার সুরেন্দ্রনাথকে সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৫ মে রওনা হন এবং লন্ডনে পৌঁছান ৩ জুন। ৪ জুন প্রাথমিক কাজ দিয়ে কনফারেন্স শুরু হয়। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার মালিক লর্ড বার্ণহাম এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ বাগ্মী লর্ড রোজবেরি তাঁদের ভাষণে কনফারেন্সে উপস্থিত সদস্যদের সম্বর্ধনা জানান। ৭ জুন সম্মেলনের প্রথম সভায় টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণে মাসুল কমানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ডাঃ ষ্ট্যানলি রীডের উত্থাপিত মাশুল কমানোর প্রস্তাব সমর্থন করেন। ৮ জুন 'সংবাদপত্র ও সাম্রাজ্য' বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই সভায় লর্ড ক্রোমার ভারতবর্ষে সংবাদপত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা উল্লেখ করলে সুরেন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা রাখেন। তিনি বলেন যে ভারতীয় সংবাদপত্রের সবকিছুই তিনি সমর্থন করেন না। তাঁরাও যে ভুল করতে পারেন সে কথা তিনি স্বীকার করে নেন। তবে দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করার মতো সংবাদপত্র ভারতবর্ষে সংখ্যায় কম। বরং যে অরাজকতার কথা বলা হচ্ছে, তা প্রাচ্যের সৃষ্টি নয়, পাশ্চাত্যের সৃষ্টি।

চতুর্থদিনের সম্মেলনের বিষয় ছিল 'সাংবাদিকতা ও সাহিত্য'। লর্ড মর্লে সেদিন সভাপতি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, লর্ড মর্লে সাহিত্যকে কলা এবং সংবাদপত্রকে শিল্প বলে মত প্রকাশ করেন। এই সম্মেলন থেকে সুরেন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন পরবর্তীকালে সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

১৯১০ সালে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'র একক মালিক হন। এর পূর্বে তিনি উপেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। ১৯১৯ সালে জানুয়ারি মাসে কাশিমবাজার মহারাজার সঙ্গে চুক্তি করেন। মহারাজা অংশীদারি মালিকানা লাভ করেন। চুক্তির শর্ত ছিল, পত্রিকাকে

লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করতে হবে। কিন্তু অবাঞ্ছিত ঘটনার চাপে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। ১৯২৪ সালে ১৭ জুন 'বেঙ্গলী'র তৎকালীন সম্পাদক পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে বিপিনচন্দ্র পাল 'বেঙ্গলী'র প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৫ সালে ১৩ মে পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৫ সালে ১৪ মে সুরেন্দ্রনাথ আবার 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক হন। 'নিউ এম্পায়ার' আর 'স্বরাজ' 'বেঙ্গলী'র সহযোগী হিসাবে প্রকাশিত হত। কিন্তু ঐ বছরেই ৬ অগস্ট সুরেন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটলে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সাংবাদিকতা থেকে রাজদ্রোহ, মানহানীকর মন্তব্য, কুৎসা এসব এড়িয়ে চলতেন। আত্মজীবনীতে এসব কথা লিখেছেন। তবে লর্ড কার্জনের প্রতি এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে 'বেঙ্গলী'তে সম্পাদকীয় লিখে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। লর্ড কার্জন গোপন ডেসপ্যাচে ভারত সচিবকে লিখেছিলেন, ''The Congress in tottering to its fall and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise.'' সুরেন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে সম্পাদকীয় লিখলেন, ''Whose peaceful demise? সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সেই শতাব্দীর অর্ধেক কাল পার হবার আগেই কংগ্রেসের নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের peaceful demise বা শান্তিপূর্ণ মৃত্যু ঘটবে। অবশ্য সেদিন হয়তো তিনি বেঁচে থাকবেন না। এই সম্পাদকীয়টি পড়ে কার্জন বিস্মিত হয়েছিলেন।

দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন যে সংবাদপত্রের সাফল্য নির্ভর করে সম্পাদকের উপর নয়, ম্যানেজারের উপর। সম্পাদকের মূল্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সংবাদপত্রের উন্নতি নির্ভর করে পরিচালন ক্ষমতার উপর। তবে ম্যানেজার ও সম্পাদক উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা দরকার। 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক হিসাবে তাঁকে অনেক ব্যক্তিগত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাতে তিনি টলেননি। 'এ নেশন ইন মেকিং'-গ্রন্থে লিখেছেন ''As a public man and as editor of the *Bengalee* I was often exposed to personal attacks. Every one taking part in public affairs must be prepared for them. They are an incident of his position and he must submit to them with all the patience that he can master in the hope, which is not always realized, that the game of personal recrimination is not even profitable to those who start it.'' সাংবাদিক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসেবে তাঁর বৃত্তিকে কখন কলুষিত হতে দেননি। 'বেঙ্গলী' ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রকাশের মুখপত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও সুরেন্দ্রনাথ :

জুন ১৮৭৫। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র সংগঠনের কাজে হাত দেন। ছাত্ররা যাতে নতুন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁদের মতামত সংগঠিত ও প্রকাশ করতে পারে সেজন্য সুরেন্দ্রনাথ একটি সমিতি গড়ে তোলার কথা বিবেচনা করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি তখন ছিল, যার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। জনগণের মতামতকে জোরালোভাবে এই সমিতি

তুলে ধরত। কিন্তু এই সমিতি ছিল প্রধানত জমিদারশ্রেণির সমিতি। কোনও সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন করা বা জনগণের জন্য জনমত গঠন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আরও বেশি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ একথা স্বীকার করেছিলেন। এই সমিতির উদ্বোধনী সভায় মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই নতুন সমিতি ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে বরাবর সুসম্পর্ক ছিল।

১৮৭৬ সালে ২৬ জুলাই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সকলেই সমিতির এমন একটা নাম চেয়েছিলেন যাতে কাজের পরিসর ব্যাপকতা লাভ করে। সমগ্র ভারতকেএকই রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে একটি সংযুক্ত ভারত গঠনের ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য নাম স্থির হল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (ভারত সভা)।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিনজনে কথাবার্তার পর স্থির হইল যে অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহনবাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। মনমোহন ঘোষের বাড়িতে এই পরামর্শ চলিল। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহনবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিতাম। যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন এতদ্বারা দেশের একটি মহা অভাব দূর হইবে, আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, 'যা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ... 'ভারত-সভা' স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ২-১ দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে 'ইন্ডিয়ান লীগ' নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হইবে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সুপ্রসিদ্ধ খ্রিষ্টিয় আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ঐ সভা স্থাপিত হইতেছে। আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু আমরা ভারত-সভা স্থাপনের সংকল্প ত্যাগ করিলাম না। ইন্ডিয়ান-লীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই। একমাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দমোহনবাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। আর সেদিনকার কথা এই মনে আছে যে সেদিন সুরেন্দ্রবাবুর একটি পুত্র সন্তান মারা যায়, তিনি তৎসত্ত্বেও আসিয়া সভাস্থাপনে সাহায্য করিলেন। আনন্দমোহনবাবু সম্পাদক, সুরেশবাবু সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজনে কমিটির সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত-সভা বসিল। আমরা ৯৩ নং কলেজ স্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া করিয়া ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম।"

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনের দিনে সকাল ১১টায় সুরেন্দ্রনাথের পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু সেকথা গোপন রেখেই সভায় যোগ দেন। পরদিন সংবাদপত্র পড়ে ঘটনাটি অনেকেই জানতে পারেন। দেশের সেবা যে তাঁর পুত্রের থেকেও প্রিয়, দেশের প্রতি যে এমন মমত্ব, এর আগে কেউ দেখেনি। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, "সেদিন তাহার প্রথম পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিল। জীবনের আশা একরূপ ছিল না। কিন্তু কালীচরণের প্রতিবাদে সভার উদ্দেশ্য যখন বিফল হইবার আশঙ্কা হইল, তখন তাহাকে আনিবার জন্য লোক ছুটিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন তালতলায় পৈত্রিক ভদ্রাসনে বাস করিতেন। সভার দূত যখন উপস্থিত হইল, তাহার অল্পক্ষণ পূর্বেই বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ শিশুর মৃতদেহের নিকটে ধূল্যবলুণ্ঠিত— জীবনের প্রথম শোকে তীব্র আঘাতে ছটফট করিতেছেন। কিন্তু যখন কর্তব্যের ডাক পৌঁছিল, তিনি না আসিলে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহা শুনিলেন, তখন অমনি গা ঝাড়িয়া উঠিয়া মৃত শিশু এবং তাহার শোকাকুলা জননীকে ছাড়িয়া সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রশোকাতুর জনকের এই দেশসেবা—নিষ্ঠা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহার পরে ভারতসভার প্রতিষ্ঠা আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। এই ঘটনায় দেশের শিক্ষিত লোক দেখিল যে সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশ এবং স্বজাতির সেবা তাহার পুত্র হইতে প্রিয়। তাহার পূর্বে কোন বাঙালি তাহার দেশকে এবং দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে এতটা ভালবাসে, তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার এই স্বদেশপ্রেমের উপরই তাঁহার প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।" (মাসিক বসুমতি, ১৩৩২)

"মিঃ আনন্দমোহন বসু অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মনোনীত হলেন এবং অক্ষয়কুমার সরকার হলেন সহকারী সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ নিজে কোন পদ গ্রহণ না করলেও একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের মধ্য দিয়ে তাঁরা যেসব আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন সেগুলি হল : ১) দেশের মধ্যে জনমত গঠন করা, ২) দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একই রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে একত্র করা, ৩) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সবশেষে, ৪) তৎকালীন গণআন্দোলনে দেশবাসীকে যুক্ত করা। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এইসব আদর্শের জন্য আমি কাজ করেছি, অন্যরাও করেছেন, কেননা প্রত্যেক চিন্তাশীল ও স্বদেশপ্রেমী ভারতীয় কাছে এটি এক সম্পদের অধিকারী হিসেবে দেখা দিয়েছিল। পঞ্চাশ বছর পরেও আমি এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি যে এইসব আদর্শ পুরোপুরি অর্জিত হয়ে না থাকলেও সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সফল হবে।"

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই সমিতির আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক সুযোগ দেখা দিল। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড সলস্‌বেরির নির্দেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার বয়সসীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৯ বছর করা হয়। ভারতীয় প্রতিযোগীদের আশা-আকাঙক্ষা বিনাশ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এব্যাপারে আন্দোলন করার জন্য ১৮৭৭ সালে ২৪ মার্চ টাউন হলে জনসভা করে। উদ্দেশ্য ছিল, লর্ড সলস্‌বেরির নির্দেশ প্রত্যাহার করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশকে একটি রাজনৈতিক মঞ্চে মিলিত করা। সুরেন্দ্রনাথের উপর ভার পড়ল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে জনমত গঠনের। ১৮৭৭ সালের ২৬ মে সুরেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত ও পঞ্জাব যাত্রা করেন। লাহোরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবশ্রেণীর মানুষ তাঁকে স্বাগত জানাল। সেখানে এক বিশাল

জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। লাহোরে কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ধাঁচে লাহোর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠন করতে সাহায্য করেন। সেখানে সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে তিনি আবদ্ধ হন। তাঁকে লাহোর থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ রাজি করান এবং প্রকাশিত হয় 'দি ট্রিবিউন' নামে সংবাদপত্র। উত্তর ভারতে যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, বাবু রামকালী চৌধুরী, বাবু হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে আসেন। সিভিল সার্ভিস যে একটি জাতীয় সমস্যা তা তিনি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উত্তর ভারতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবার পর তাঁর সহকর্মীরা ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণে সুরেন্দ্রনাথকে প্রেরণ করতে উদ্যোগী হন। ১৮৭৮ সালে শীতকালে তিনি হওনা হন। বোম্বের (বর্তমান মুম্বাই) জনসভায় সিভিল সার্ভিস বিষয়েও প্রস্তাব এবং স্মারকলিপির প্রতিবেদনের সারাংশ গৃহীত হয়। সেখানে ফিরোজ শা মেহতা, কাশীনাথ ত্রৈম্বক তেলাং প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর সুরাট ও আমেদাবাদে ভ্রমণের পর পুনায় পৌঁছে মিঃ রানাডের অতিথি হন। পুনার সভায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেখান থেকে মাদ্রাজে গিয়ে মিঃ ধানকাটু রাজুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে জনসভা করা সম্ভব হয়নি তবে সিভিল সার্ভিসের প্রস্তাব একটি আলোচনাসভায় গৃহীত হয়। ১৮৮৭ সালের মধ্যে ভারতসভার ১২৪টি শাখা শুধুমাত্র বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল।

কলকাতায় ফিরে এসে সুরেন্দ্রনাথ একটি সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। ঠিক হল তাদের আন্দোলন ইংল্যান্ডেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ভারত পরিক্রমার ফল কি হয়েছিল সে বিষয় পর্যালোচনা করতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "ব্রিটিশ শাসনে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোককে নিয়ে একই উদ্দেশ্যে একই মঞ্চে আনার চেষ্টা প্রথম। জাতি, ভাষা, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে ভারতীয়দের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন এটা বুঝিয়ে দেওয়া হল ভারতবর্ষের লোক সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছোতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এভাবে জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের এক ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়েছিল।"

সিভিল সার্ভিস সম্পর্কিত সর্বভারতীয় স্মারকলিপিটি ইংল্যান্ডে হাউস অব কমন্স-এ পাঠানোর জন্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মিঃ লালমোহন ঘোষকে নির্বাচিত করে। কিন্তু সেখানে প্রতিনিধি পাঠানো ছিল ব্যয়বহুল ব্যাপার। সুরেন্দ্রনাথ নিজে অর্থ সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছাড়াও মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছ থেকেও অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। এই পত্র নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বহরমপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ীর এস্টেটের ম্যানেজার রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লালমোহন ইংল্যান্ডে গিয়ে জন ব্রাইট-এর সভাপতিত্বে এক অসাধারণ বক্তৃতা রাখেন। এই সভার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হাউস অব কমন্স-এ কতগুলি বিধান উপস্থিত করা হল, যেগুলি বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস নামে আইনে রূপ পেল। এভাবে ইংল্যান্ডে গিয়ে ভারতের সমস্যার কথা তুলে ধরে আন্দোলন করার ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা উৎসাহিত হলেন।

বড়লাট লিটন প্রবর্তিত দেশীয় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে ভারতসভাকে সঙ্গে নিয়ে

সুরেন্দ্রনাথ এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। নীলকর আন্দোলনের জন্য হরিশ্চন্দ্রের বিখ্যাত 'পেট্রিয়ট'র প্রেস আইনের বিরুদ্ধে সুর ছিল নরম। কৃষ্টদাস পালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'র প্রতিবাদে কোন ঝাঁঝ ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ভাইসরয় কিছু একটা বোঝালেন, তিনি সরকারের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এই প্রেস আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়নি। শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা এই আইনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার কাগজকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি কাগজে পরিবর্তিত করেন। উল্লেখযোগ্য যে, অমৃতবাজার তখন অর্ধেক ইংরেজি ও অর্ধেক বাংলায় প্রকাশিত হত।

সুরেন্দ্রনাথের খ্রিস্টান বন্ধুদের মধ্যে ডাঃ কে. এম. ব্যানার্জি এবং ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ডের রেভাঃ কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সাহায্য করেছেন। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি, যিনি কে এম ব্যানার্জি নামেই বেশি পরিচিত, ভারতসভায় যোগ দেন, সভাপতিও হয়েছিলেন। তাঁদের পেয়ে আন্দোলন সর্বজনীন রূপ পেল। দেশীয় প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরালো করার উদ্দেশ্যে টাউন হলে এক সভার আয়োজন করা হল। সভায় প্রচুর লোক হয়েছিল। সভা শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে এসে আনন্দমোহন বসু সভা বন্ধ রাখার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন, কেননা কলকাতায় খবর ছিল সেদিন ইংল্যান্ড-রাশিয়ার যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অবশ্য কোন যুদ্ধ বাধেনি। সুরেন্দ্রনাথ সেদিন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানালেন, সভা করতেই হবে। তিনি বলেন, "ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এটাই হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথম বড় ধরনের বিক্ষোভ সভা। সভা বন্ধ হয়ে গেলে লোকে আমাদের উপর বিশ্বাস হারাবে, আর ভবিষ্যতে এরকম সভা করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে এখানেই হবে আমাদের সমাপ্তির শুরু।" বস্তুত দেশীয় প্রেস আইনের মৃত্যুঘণ্টা সেদিনই বেজেছিল। এর সাফল্যের পিছনে ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বড় ভূমিকা। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতসভার এই আন্দোলনের ফল পাওয়া গেল লর্ড রিপন কার্যভার গ্রহণ করার পর। রিপন দেশীয় সংবাদপত্র আইন রদ করে দিলেন। এর পর সুরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়লেন মফঃস্বলের শহরে শহরে দেশবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে।

ভারতসভা সিভিল সার্ভিস আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়াও অস্ত্র আইন, সূতিবস্ত্র আমদানি করা থেকে কর রেহাই প্রভৃতি বিষয়েও আন্দোলন করে মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতসভা কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ সালে পাশ হয়। এ প্রসঙ্গে নিখিল সুর লিখেছেন, "প্রজাস্বত্ব আইন সমর্থন করার পর ভারতসভা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবিতে জনসভার আয়োজন করল। এইসব সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন সাধারণ কৃষকগণও। ভারতসভা প্রতিষ্ঠার সময়ে উদ্যোক্তাদের কাছে লিখিত একখানা পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "ভরসা করি এতদিন পরে এরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা উপযুক্তরূপে দেশীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ হইবে।"

বঙ্কিমের এই আশা যে অনেকখানি সফল হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে কৃষকদের নিয়ে ভারতসভার এই মাতামাতি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভালভাবে গ্রহণ করল না। 'হিন্দুপ্যাট্রিয়ট' পাঠকদের কাছে আবেদন জানাল, তারা যেন ভারতসভা কর্তৃক

আয়োজিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের জন্য জাতীয় তহবিলে কোন অর্থ দান না করে।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতসভার কার্যকলাপ প্রধানত বাংলায় কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, সমস্ত দেশের চিন্তা ও রাজনৈতিক দায় দায়িত্ব অর্পিত হল জাতীয় কংগ্রেসের উপর। সুরেন্দ্রনাথ নিজে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ভারতসভা পূর্বের সর্বভারতীয় চরিত্র হারাল।"

কলকাতা কর্পোরেশন বিস্তৃত হবে বারাকপুর পর্যন্ত

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন ও স্বায়ত্তশাসন পত্তনের পুরোধা সুরেন্দ্রনাথ :
সুশাসন স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না, তাই চাই স্বায়ত্তশাসন। লর্ড কার্জনের কলমের এক আঁচড়ে যখন পুর আইনের স্বায়ত্তশাসনের সমাধি রচিত হলে, সুরেন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন প্রতিরোধ আন্দোলন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অবিচল থেকে শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৯২ সালে কাউন্সিল পুনর্গঠিত হলে কলকাতা কর্পোরেশনের একজন সদস্য হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। এরপর ১৯০১ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে আট বছর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। সদস্য থাকাকালীন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে জড়িত গণতন্ত্র হরণকারী কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিল উত্থাপিত হয়। লেফটান্যান্ট গভর্নর স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি এই বিলের প্রণেতা। তাই নাম 'ম্যাকেঞ্জি বিল'। এই বিল কলকাতা কর্পোরেশনের কাজকে সঙ্কুচিত করে একে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই এটি গণতন্ত্রহরণকারী বিল নামে খ্যাত হয়েছিল। ম্যাকেঞ্জি মন্তব্য করেছিলেন, কলকাতা কর্পোরেশন হল 'বাকযুদ্ধ এবং কাজে বিলম্ব করার অস্ত্রাগার'। তিনি প্রস্তাব করেন মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের প্রধান স্বাধীনভাবে কাজ করবে, তিনি কর্পোরেশনের ক্ষমতার অধীন থাকবে না। কমিশনাররা যতখুশি কথা বলতে পারবেন কিন্তু চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের কাজে কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কর্পোরেশনের ক্ষমতা আরও কমানোর জন্য একটি জেনারেল কমিটি এবং সমন্বয়কারী এক স্বাধীন কর্তার পদ সৃষ্টি করার কথা বলেন।

১৮৯৭ সালে ম্যাকেঞ্জি বিল উত্থাপিত হয়েছিল। দু'বছর ধরে বিলটির উপর বিতর্ক চলার পর সেটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ সিলেক্ট কমিটির সদস্য ছিলেন। সেখানে তিনি বিলটির বিপক্ষে প্রবল আপত্তি জানান।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ ছিল বিলটির ওপর বিতর্কের শেষ দিন। সেইদিনটি রামমোহনের মৃত্যুদিন। সুরেন্দ্রনাথ ঐ মৃত্যুদিন উপলক্ষে একটি সভায় যাবার জন্য আমন্ত্রণলিপি পেয়ে দুঃখে অভিভুত হয়ে পড়েন এবং শেষবারের মত বিলটির বিরোধিতা করে বলেন, "কাউন্সিলে প্রবেশ করার সময় একখানা পত্র পেলাম, এই পত্র মনে করিয়ে দিল আজ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিবস। মনে হচ্ছে এটি যথার্থই হয়েছে, কেননা যেদিনটিতে এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালির মৃত্যুদিন পালিত হচ্ছে সেদিনটিতে সেই মহান পুরুষের প্রিয় বাসস্থান ও কর্মস্থানে স্বায়ত্তশাসনের সমাধি রচিত হচ্ছে।" বিলের সমর্থনে সরকারের যুক্তি ছিল কলকাতার সাফাই ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে, কর্পোরেশনে কাজের চেয়ে কথা বেশি হয়, সদস্য সংখ্যা জনগণের অনুপাতে বেশি ইত্যাদি। সুরেন্দ্রনাথ এইসমস্ত অভিযোগকে যুক্তি দিয়ে অসার প্রমাণ

করলেও বিলটি সিলেক্ট কমিটি থেকে পাশ হয়ে যায়। লর্ড কার্জনের নির্দেশে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে সরকার মনোনীত সদস্যের সংখ্যা সমান করা হল। সদস্য সংখ্যা ৭৫ থেকে কমে হল ৫০। এভাবে কর্পোরেশনের ক্ষমতাকে কর্পোরেশন, চেয়ারম্যান (যিনি সরকারের লোক) এবং জেনারেল কমিটির মধ্যে ভাগ করে সেখানকার গণতন্ত্রের শ্বাস রুদ্ধ করা হল। সুরেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করে বিলটিকে আটকাতে না পেরে তিনি এবং বাকি ২৭জন কমিশনার পদ থেকে ইস্তফা দেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কর্পোরেশনের ক্ষমতা যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তবে এটিকে সরকারের একটি বিভাগে পরিণত করাই শ্রেয়। ১৯০০ সালের ১ এপ্রিল এটি আইনে পরিণত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এরকম অপমৃত্যু তাঁকে আরও জেদি করে তোলে। এটিকে তিনি সর্বভারতীয় আন্দোলনে রূপ দেন। মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে (১৮৯৮) কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২১ সালের ৪ জানুয়ারি মন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রী হবার পর সেই কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি আইন সংস্কারের ভার তাঁর উপরই বর্তাল। সুরেন্দ্রনাথ 'এ নেশন ইন মেকিং'-এ লিখেছেন, "আমার মন্ত্রিত্বকালে মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন। আমি অন্যত্র এই আইন প্রণয়নের বিবরণ দিয়ে দেখিয়েছি বহুদিন আগেই এটা করা উচিত ছিল। আমার দাবি এই যে পুরনো আইনের সম্পূর্ণ সংশোধন করে নতুন আইনকে নতুন সংস্কারের সঙ্গে মিল রেখে সাজিয়েছি। বস্তুত এই আইনে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা করদাতাদের প্রতিনিধিদের হাতে অর্পিত হয়েছে। প্রতিনিধিদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল আইনে সংবিধানগত পরিবর্তন জনগণের দাবি অনুযায়ী করা হয়েছে। নতুন আইনে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে যা সময় আরো সুখদায়ক, আবেগ ও সংস্কার বর্জিত হলে সাধারণ লোকের স্বীকৃতি পেত। আজ আমরা স্বরাজ সম্পর্কে অনেক কিছু শুনে থাকি, কিন্তু আজ যারা স্বরাজের কথা বলছে, তারা যখন শৈশবের দোলনায় দোল খেতেন তখন থেকেই আমি স্বরাজপন্থী। ভারতীয়দের মধ্যে আমিই প্রথম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের (ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস) এর কথা দাবি করি। নতুন আইন বলে সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় নগরী কলকাতায় পুর আইনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত স্বরাজ। ভুললে চলবে না, কলকাতার আদায়ীকৃত কর সমগ্র বাংলার আদায়ীকৃত করের এক পঞ্চমাংশ। নতুন আইন অনুসারে জনপ্রতিনিধিদের হাতেই থাকবে এই রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ। কর্পোরেশেন সদস্যদের চার পঞ্চমাংশ সদস্য করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং তারাই হবেন সর্বোচ্চ কর্তৃত্বসম্পন্ন। প্রধান কর্মসচিবকে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে তারাই নির্বাচিত করবেন। মেয়র, যিনি হাউসের স্পিকার হবেন, তিনিও নির্বাচিত হবেন। ভোটাধিকার ব্যাপক করে, একাধিক ভোটপ্রথা বিলোপ করে এবং স্ত্রীলোকদের নির্বাচকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করে কর্পোরেশনের গণতন্ত্রকে আরও গণতন্ত্রী করা হয়েছে।

এসব কাজ অগ্রগতির নির্দেশক হলেও চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি স্বীকৃতিসূচক একটা শব্দও প্রকাশ করেনি, বরং কর্পোরেশনের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে বলে সমালোচনা করেছে। অশ্রদ্ধা করে প্রকৃত ঘটনা তারা উপেক্ষা করলেন যে, মূল বিলে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা কোন সম্পর্ক ছিল না। (১৯১৭ সালে লর্ড সিংহ প্রবর্তিত বিলে সাম্প্রদায়িক

ব্যবস্থার কথা থাকায় আমি ইচ্ছা করেই তা বাদ দিয়েছিলাম।) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা যাতে স্থায়ী নীতি না হয়ে দাঁড়ায় সে কারণে আমি তা সাময়িকভাবে গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলাম। এই প্রথার বিরুদ্ধে আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলাম। কিন্তু অবাক করার মতো ঘটনা হল, নিয়তির পরিহাসও বটে, যে স্বরাজপন্থীরা বিরোধিতা করেছিল, তারাই হিন্দু-মুসলমান চুক্তি করে প্রস্তাব দিলেন সমগ্র বাংলায় ১১৬টি পুরসভার প্রত্যেকটিতে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। তারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চেয়েছিলেন এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পুরসভাগুলিকে নিশ্ছিদ্র কক্ষে ভাগ করে যাতে তারা ঐকবদ্ধ ভোট দানের অধিকারকে প্রয়োগ করতে না পারে। কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নীতির সূচনা হল। এই নীতির সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে নিন্দনীয়, কারণ ভারতীয় জাতিত্ব বিকাশের পক্ষে এটি ছিল মারাত্মক অন্তরায়।

আমার জীবনে একটি স্বপ্ন সফল করেছে কলকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন। ১৯২১ সালে বিলটি উত্থাপন করে বলেছিলাম— "২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ এই কথাগুলো আমি শেষ বলেছিলাম। ২২ টা বছর এসেছে ও গেছে। তখন আমি আশা প্রকাশ করেছিলাম এবং ভবিষ্যতবাণী করেছিলাম অদূর ভবিষ্যতে আমার জন্মভূমি এই নগরে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনে অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। সে সময় এসে গেছে, সে দিনটি আজ উপস্থিত। এই দিনটি দেখবার জন্যই তো এত দিন বেঁচে আছি। নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি চিৎকার করব না, কেন না বহু কাজ এখনও বাকি। আমি দাবি করতে পারি, আমার মধ্যে বিশ্বাসের অনির্বাণ শিখা আজও যে সমুজ্জ্বল তা আজকের এই কার্যাবলি থেকে প্রমাণিত।"

সুরেন্দ্রনাথ সরকারি কাজের ভারতীয়করণ করতে চেয়েছিলেন। সে কারণে সুযোগ পেলেই প্রশাসনে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে সচেষ্ট থাকতেন। তবে কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে কোনও আপস করতেন না। ১৯২১ সালে চেয়ারম্যান পেইন ছুটিতে গেলে সুরেন্দ্রনাথ জে এন গুপ্তকে সাময়িকভাবে ঐ পদে নিয়োগ করেন। জে এন গুপ্ত ছিলেন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এবং তিনিই প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সদস্য। যাঁকে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু মি. গুপ্তকে যখন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে স্বাস্থের কারণে ছুটি নিতে হল, তিনি আইনসভার সদস্য ও কর্পোরেশনের বেসরকারিভাবে নির্বাচিত সদস্য মি. সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে নিযুক্ত করেন। মি. মল্লিক তাঁর কাজের জন্য সকলের কাজে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এভাবে সুরেন্দ্রনাথ প্রশাসনের সুযোগ পেলেই ভারতীয়দের অনুপ্রবেশন ঘটিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা কর্পোরেশনের সীমানাকে বাড়িয়ে বারাকপুরকে এর অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন।

১৯২১ সালে ২২ নভেম্বর আইনপরিষদে বিলটি পেশ হয়, আর ১৯২৩ সালের ৭ মার্চ সেটি পাশ হয়। নতুন আইনে পুরসভা সাধারণ কমিটি এবং চেয়ারম্যান এদের পৃথক কর্তৃত্বের বিলোপ ঘটল। ঠিক হল কর্পোরেশনের পাঁচ ভাগের চারভাগ সদস্য হবেন করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত। প্রধান কর্মসচিব করদাতারার দ্বারা নির্বাচিত হবেন। কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ থেকে হল ৮০। তবে শহরতলী এলাকা যুক্ত করার ফলে সংখ্যা বেড়ে হল ৯০। এর মধ্যে মুসলিমদের জন্য আসন ছিল ১৩। তবে হাসান সুরবর্দির প্রস্তাব মত মুসলমান আসন বৃদ্ধি পেয়ে হল ১৫। একাধিক কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকার বিলোপ, মহিলাদের

ভোটদাতারূপে গণ্য করে কর্পোরেশনের গঠন প্রক্রিয়াকে আরও গণতন্ত্রীকরণ করা হল।

কর্পোরেশনের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দল জয়লাভ করলে প্রথম মেয়র হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। সুরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের মেয়র হওয়া মেনে নিতে পারেননি, কেননা তাঁর পুরসভার কাজে কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। তিনি বলেন, গ্লাডস্টোন, পামারস্টোন বা ডিসরেলীর মত লোককেও মেয়র পদে অধিষ্ঠিত করা হয়নি। নগরসেবায় যারা যশ অর্জন করেছে তাদেরই এই পদে বসানো উচিত। চিত্তরঞ্জন দাশের মিউনিপ্যাল কাজে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। মিউনিস্যাল আইনে কর্পোরেশন সভাপতি পদকে প্রধান কর্মকর্তার পদ থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন কার্যত দুটি পদকেই একত্র করলেন। পদাধিকার বলে তিনি স্পিকার কিন্তু কার্যত প্রশাসনের সর্বময় কর্তা হলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রও এই ক্ষমতা অনুসরণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের মতে এভাবে তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে মহান মার্কেটের মধ্যে এক ফকিরের শবদেহ কবর দেওয়ার নির্দেশ দেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন— কেউ কি কখনও শুনেছে ব্রিটেনে হাউস অব কমন্স-এর স্পিকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেছে?

সুরেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল উত্থাপন করার পর বিলটি গ্রহণ করার জন্য বলেছিলেন, "১৮৯৯ সাল থেকে আমি এই আশা নিয়ে বেঁচে আছি যে আমার নিজের শহরকে স্বাধীনতার সাজে সজ্জিত করে তার পুর্নজন্ম দেখে যেতে চাই।"

সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

রাষ্ট্রগুরু ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন, আবার কখনো সুরেন্দ্রনাথের কাজের জন্য দুঃখও পেয়েছিলেন।

২ মে ১৮৮৩ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ নরিস একটি মামলায় হিন্দু গৃহদেবতাকে আদালতে আনার নির্দেশ দিলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করেন। ফলে আদালত অবমাননার জন্য দু'মাস জেল হয় (৫ মে থেকে ৪ জুলাই, ১৮৮৩)। জেল থেকে মুক্তিলাভ করলে ফ্রি চার্চ কলেজ প্রাঙ্গণে সুরেন্দ্রনাথের এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় উপস্থিত থেকে গান গেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি মডারেট ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ বাধলে 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথকে দেশনায়ক রূপে বরণ করে নেবার জন্য বঙ্গবাসীকে আহ্বান করে লিখেছেন— "অল্পকাল পূর্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন প্রথম জোয়ার আসিয়াছিল তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারি দিকে 'নেতা' 'নেতা' 'নেতা' রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত সুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মতো সাহিত্যরসবিহ্বল অকর্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিতান্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের তখন এমনি বিপদের দিন গেছে যে, 'আমি নেতা নই' বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠগড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।

হঠাৎ সমস্ত দেশের এইরূপ উৎকট 'নেতা'-বায়ুগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে, কাজের

হাওয়া দিবামাত্রই স্বভাবের নিয়মে সব-প্রথমে নেতাকে ডাক পড়িবেই। সেই ডাকে প্রথম ধাক্কায় বাজারে ছোটো-বড়ো ঝুঁটা-খাঁটি বহুবিধ নেতার আমদানি হয় এবং লোকের প্রাণের গরজে বিচার করিবার সময় পায় না— নেতা লইয়া টানাটানি-কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে করিয়া অনেক মিথ্যার, অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আসল সত্যটুকু এই যে, আমাদের নিতান্তই নেতা চাই— নহিলে আমাদের আশা-উদ্যম-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভার সভাপতিকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন 'নেতা নেতা' করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্বার সর্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ সম্বন্ধে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও অবশেষে যাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে তাঁহার পরিচয় অদ্য যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জানি এই সভাস্থলে দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ম্বরা হইতেন তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান— আজ বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মতো বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আজ আহ্বান করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন সেদিন ইংরেজিশিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন— সেই বন্দরের নাম রাজপ্রাসাদ। সেখানে আছে সবই— লোকে যাহা-কিছু কামনা করিতে পারে, অন্নবস্ত্র, পদমান, সমস্তই রাজভাণ্ডারে বোঝাই করা রহিয়াছে। আমরা ফর্দ ধরিয়া ধরিয়া উচ্চস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম— ডাঙা হইতে উত্তর আসিল, 'এসো-না, তোমরা নামিয়া আসিয়া লইয়া যাও।' কিন্তুআমাদের নামিবার ঘাট নাই; আর-আর সমস্ত বড়ো বড়ো জাহাজে পথ আটক করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া আছে তাহারা এক-ইঞ্চি নড়িতে চায় না। এ দিকে ফর্দ আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের গলা ভাঙিয়া গেল, দিন অবসান হইয়া আসিল। কখনো বা রাগ করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি, কখনো বা চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেহ নিষেধও করে না, কেহ পথও ছাড়ে না; বাধাও নাই, সুবিধাও নাই। আর-আর সকলে দিব্য কেনাবেচা করিয়া যাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, আলো জ্বলিতেছে, ব্যান্ড্ বাজিতেছে। আমরা সন্ধ্যাকাশের অবিচলিত নক্ষত্ররাজি ও রাজবাতায়নের অনিমেষ দীপমালার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে আমাদের 'দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ' অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম।

এইভাবে কত দিন, কত বৎসর কাটিত তাহা বলিতে পারি না— এমন সময় এই নিঃসহ নিশ্চলতার মধ্যে বিধাতার কৃপায় পশ্চিম আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড়োরকম ঝড় উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পুবের মুখে হুহু করিয়া ছুটাইয়া চলিল; অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম, সে যে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যান্ড্ বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে হুলুধ্বনি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এতদিন অভুক্ত থাকিয়া পরের পাকশালা হইতে কেবল বড়ো-বড়ো ভোজের গন্ধটা পাইতেছিলাম, আজ যে দেখিতে দেখিতে সম্মুখে পাত পাড়িয়া দিল। আমরা জানিতাম না, এ যজ্ঞে আমাদের মাতা আমাদের জন্য এতদিন সজলচক্ষে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সুরেন্দ্রনাথের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আপন কোলের দিকে টানিয়াছেন। আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিম-বন্দরের শাদা-পাথরে-বাঁধানো সোনার দ্বীপে এমন সুস্নিগ্ধ সার্থকতা এক দিনের জন্যও লাভ করিয়াছেন? এমন আশাপরিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন?

বিধাতার কৃপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটেআনিয়া ফেলিয়াছে ইহার নাম আত্মশক্তি।..... আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশের এই মঙ্গলমহাসনে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক করি। জানি, এরূপ কোনো প্রস্তাব কখনোই সর্ববাদিসম্মত হইতেই পারে না, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে, তাহার বেশি আর কিছুই হইবে না। যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহারা এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাকে দেশনায়কের উপযুক্ত গৌরবরক্ষার সামর্থ্য দিন, সকলের যোগ্যতা মিলিত করিয়া তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়া তুলুন।"[২]

সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখলেও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির নির্বাচন নিয়ে বিরোধ বাধলে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে আসে। কবি চেয়েছিলেন হোমরুল আন্দোলনের নেতা অ্যানি ব্যাসান্তকে সভাপতি নির্বাচিত করতে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেট নেতারা এর বিরোধিতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ একটি পত্র সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার অফিসে পৌছে দেন। ঐ দিনই (১৪ সেপ্টেম্বর) কবি 'বেঙ্গলী' পত্রিকা অফিসে রথীন্দ্রনাথ মারফত একটি চিঠি পাঠিয়ে সম্মতিপত্রটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সেই সম্মতিপত্রটি ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

"To the Secretaries
32nd. Indian National Congress,
9. Old Post Office Street, Calcutta.

Dear Sir,

I am in receipt of your letter informing me of my election as chairman of the Reception Committee held, at 4-3A College Square on Tuesday, the 11th September, 1917.

After Careful consideration of the difficulties of the situation and in view of my conviction that Mrs. Besant ought to be President of the next Congress, I feel it duty to overcome my reluctance and accept my election to the chairmanship of the Calcutta Reception committee.

Yours truly,
Sd/Rabindra Nath Tagore
6. Dwaraka Nath Tagore Street, September, 14"[৩]

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকায় 'Sir Rabindranath's Somersault' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে রবীন্দ্রনাথকে অস্থিরচিত্ত আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করে লিখেছিলেন, তিনি কাব্যের জগৎ থেকে উচ্চাভিলাষ নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। নীতিহীন নতুন রাজনীতিক বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অধঃপতনের দিকে হাঁটছেন। কিন্তু তিনি খুব বিলম্ব করে ফেলেছেন। রাজনীতি আর কাব্যের জগৎ ভিন্ন। সুরেন্দ্রনাথ কবিকে রাজনীতিতে 'নভিস' বা শিক্ষানবিশ বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এই আক্রমণে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আঘাত পেয়েছিলেন, কেননা তিনিই 'দেশনায়ক' শিরোনামে প্রবন্ধ সুরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথের প্রতি কবির নরম মনোভাব থাকলেও অন্যান্য মডারেটদের নীতিকে তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন না।

এই বিরোধের প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে আমরা দেখি, কবির প্রতি সুরেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য সম্মিলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য সম্মিলন' সম্বন্ধে ভাষণ দান করেছিলেন। এই ভাষণ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আপনারা রবীন্দ্রবাবুকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করুন, যিনি আমাদের সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার চেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আর নেই। গদ্যে-পদ্যে তাঁর অসীম প্রতিভা। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি আমাদের একজন প্রধান অধিনায়ক, ইহা তিনি স্বীকার করুন আর নাই করুন।"[৪]

ঋণ স্বীকার :

১। A nation in making— *Sir Surendranath Benerjea*
২। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র— *বিনয় ঘোষ*
৩। কলকাতা পুরশ্রী— সম্পাদক *অমলেন্দু ভট্টাচার্য*
৪। এ নেশন ইন মেকিং
৫। ইন্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন স্যুভিনির, ১৯৮৮
৬। ইস্টরি অব দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন— *যোগশেচন্দ্র বাগল*
৭। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ— *মণি বাগচি*
৮। উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল-একাল— *কানাইপদ রায়*

৯। দি বেঙ্গলী প্রেস— *সমরজিৎ চক্রবর্তী*
১০। হিস্টরি অব দি কংগ্রেস— *পি সীতারামাইয়া*
১১। স্পীচেস, ইন্ডিয়ান প্রেস, লন্ডন— *এম বার্নস*
১২। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— *সুনীলকুমার বসু*
১৩। স্পীচেস অব রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি— ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
১৪। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি— *নিখিল সুর*

ইংল্যান্ডে প্রেস কনফারেন্সে রাষ্ট্রগুরু (১৯০৯)

লেখক পরিচিতি : *সম্পাদক, 'উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল'*

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জ

"সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর উত্তর পুরুষ সুবিচার করেনি; তাঁর সমকালীনদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শেষ জীবনে তাঁর প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। অথচ ইহা ইতিহাস সমর্থিত যে তাঁর কাছেই বাঙালী তথা ভারতবাসী একদিন রাজনীতির প্রথমপাঠ গ্রহণ করেছিল; তাঁরই নেতৃত্বে একদা পরিচালিত হয়েছিল স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য দেশব্যাপী নিয়মানুগ আন্দোলন। পঞ্চাশবছর ধরেই রাজনীতির আন্দোলন চালিয়েছিলেন এই একটি মানুষ। রানাডের অসাধারণ প্রতিভা, অথবা স্যর ফিরোজ শা মেহতার অসামান্য কৌশল তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি বটে, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি কারোর চেয়ে কম ছিলেন না। স্বজাতির রাজনৈতিক মুক্তি সাধনে ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা।"

১৮৪৮ নভেম্বর ১০ : কলকাতার তালতলা অঞ্চলে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা সুচিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা দুর্গাচরণের দ্বিতীয় স্ত্রী জগদম্বা দেবী। সুরেন্দ্রনাথ জগদম্বা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র।

১৮৫৩ : ৫ বছর বয়সে বাংলা স্কুলে ভর্তি হন। এই বছর পিতা দুর্গাচরণ উইল করেন যাতে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে।

[পরবর্তীকালে নিজাম সরকারের কর্মচারি ক্যাপ্টেন ডারটনের বদান্যতায় স্থাপিত প্যারেনটাল অ্যাকাডেমি ইনস্টিটিউশনের ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, প্যারিচরণ সরকারের মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন এবং কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন তার মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করে।]

১৮৬৩ ডিসেম্বর : ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৬৮ : ডবটন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন।

১৮৬৮ মার্চ ৩ : প্রথম বিলেত যাত্রা। সঙ্গী রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত। বিলেত যাবার খবরে মা মূর্ছা যান। বিলেতে ডব্লিউ সি ব্যানার্জি তাকে অভ্যর্থনা জানান।

১৮৬৯ : সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ। কিন্তু বয়স নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার অভিযোগে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। সে সময়কার নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীর বয়স হবে ১৯ বছরের বেশি কিন্তু ২১ বছরের কম।

১৮৬৯ জুন ১১ : আদালতের নির্দেশে সিভিল সার্ভিসে পুনর্বহাল হন।

১৮৭০ ফেব্রুয়ারি ২০ : পিতার মৃত্যু।

১৮৭১ : সিভিল সার্ভিসের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৮৭১ নভেম্বর ২২ : সিলেটে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগ দেন।

১৮৭২ : যুধিষ্ঠির মামলায় (নৌকা চুরির মামলায়) চক্রান্তের শিকার হয়ে মিথ্যা এজেহার দেবার জন্য দুটি অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

১৮৭৩ : বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড জাতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকেন।

১৮৭৪ : সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত হন।

১৮৭৪ মার্চ : দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে। সফল হননি। চাকরী হারান।

১৮৭৫ জুন : কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। এই সময় গভীর সংকটের মধ্যে পড়লেন। ছাত্র সংগঠনের কাজে হাত দেন। আনন্দমোহন বসুকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রসভা গঠন করেন তরুণ ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

১৮৭৬ জুলাই ২৬ : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক কর্মজীবনে সূচনা এখান থেকেই। সহযোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ঐদিন তাঁর পুত্র মারা যান। তবুও কর্তব্যের ডাকে অ্যাসোসিয়েশনের সভায় উপস্থিত হন।

১৮৭৭ মার্চ ২৪ : সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বয়স সীমা বাড়ানো ও একই সময়ে পরীক্ষা নেবার দাবিতে টাউন হলে জনসভা। ২৬মে উত্তরভারত ও পরে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ।

১৮৭৮ মার্চ : দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন (ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট) পাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১৮৭৯ জানুয়ারি ১ : সাপ্তাহিক 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

১৮৮০ : মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে পদত্যাগ এবং ফ্রি চার্চ কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। কলকাতা থেকে বারাকপুরের মণিরামপুর অঞ্চলে আগমন। আদালত অবমাননার জন্য ৫ মে শুনানির ধার্য হয়। মামলার দিন বারাকপুরের বাড়ি থেকেই রওনা হন। আসার সময় স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেন।

১৮৮১ : ফ্রি চার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাছে নিমগ্ন ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এই কলেজে যুক্ত ছিলেন।

১৮৮২ : ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বাতিল। নিজের স্থাপিত রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশনের ভার নিয়ে নানারকম সংস্কার করে এটিকে ১৮৮৪ সালে রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) নাম রেখে প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসেবে গড়ে তোলেন।

১৮৮৩ মে ২ : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি একটি মামলায় হিন্দু গৃহদেবতাকে আদালতে আনার আদেশ দিলে তিনি 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করেন। ফলে আদালত অবমাননার জন্য কারণ দর্শাতে আদেশ জারি করা হয়। তারপর কারাবাস। প্রেসিডেন্সী জেলে ৫ মে থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত কারাবাসে থাকেন।

১৭ জুলাই : জাতীয় অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা জন্য জনসভা।

২৮-৩০ ডিসেম্বর : কলকাতার এলবার্ট হলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন বসে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে। এই কনফারেন্সেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দেয়।

১৮৮৪ : অর্থসংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ

১৮৮৫ ডিসেম্বর ২৫, ২৬, ২৭ : ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে।

ডিসেম্বর ২৮ : বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। হিউমের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম।

(২১ জানুয়ারি ১৮৮৫—১ মে ১৮৮৯ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি—১৮৯১—১৫ অক্টোবর ১৯২১ পর্যন্ত উত্তর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান ছিলেন।)

১৮৮৬ : কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগদান করেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের সদস্যগণ এই অধিবেশনে যোগদান করার ফলে এর পৃথক অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। শাসন সংস্কার ও কাউন্সিল সংস্কার দাবি করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৮৮৭ : মহারানীর রাজত্বে জুবিলি বছর। ভাইসরয় লর্ড ডাফোরিনের কাছ থেকে শাসন সংস্কার বিষয়ে ঘোষণা আদায়। মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশন বসে।

১৮৮৮ : এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন।

১৮৮৯ : কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশন বসে। সুরেন্দ্রনাথের উপর অর্থসংগ্রহের ভার পড়ল। সেই সভায় তিনি এমন আকর্ষক বক্তৃতা দেন যে উপস্থিত মহিলাদের অনেকেই অলংকার খুলে দেন। টাকা ওঠে প্রচুর। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য Brad Laugh এই অধিবেশনে যোগ দেন।

১৮৯০ মার্চ : ডেপুটেশন দেবার জন্য ইংল্যান্ড রওনা হন। ডেপুটেশনের কাজ হল কংগ্রেসের মতামত প্রচার করা ও রাজনৈতিক সংস্কার চাওয়া।

৬ জুলাই : বম্বে প্রত্যাবর্তন।

১৮৯১ : 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক ছিলেন কমলকৃষ্ণ ভটাচার্য। পরে কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশরদ এর সম্পাদক হন। রবীন্দ্রনাথ এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮৯২ : অছি পরিষদের সংস্কার।

১৮৯৩ : আইন পরিষদের প্রথম বৈঠক সংস্কারের পর। কলকাতা কর্পোরেশন থেকে নির্বাচিত হয়ে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হন

১৮৯৪ : মাদ্রাজ কংগ্রেসের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় একই সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন।

১৮৯৫ নভেম্বর : পুণা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হন।

১৮৯৬ : কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৮৯৭ ডিসেম্বর : ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল কমিশনের সাক্ষ্য দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কিত বিষয়।

১৮৯৮ : লর্ড কার্জন বড়লার্ট হয়ে এ দেশে আসেন। শিমুলতলায় বাড়ি নির্মাণ করেন। তার 'এ নেশন ইন মেকিং'-এর অনেকটা শিমুলতলায় লেখা।

১৮৯৯ সেপ্টেম্বর ২৭ : নাগরিক অধিকার হননকারী ম্যাকেঞ্জিবিল ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হলে তুমুল বিতণ্ডা দেখা দেয়। এই আইন পাশ হবার ফলে কলকাতা পুরসভা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার হারিয়ে একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কলকাতা কর্পোরেশনে ভারতীয় সদস্যসংখ্যা কমানোর প্রতিবাদে কর্পোরেশনের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

১৯০০ : লাহোর-কংগ্রেসে যোগ দেন। 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তর। ভারতীয় দৈনিগুলির মধ্যে 'দি বেঙ্গলী' প্রথম রয়টার'র গ্রাহক হয়।

১৯০১ : বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে না থাকলেও ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের পদে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯০২ : আমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতিরূপে যোগ দেন।

১৯০৩ ডিসেম্বর : কার্জন সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকার দুটি জেলা নিয়ে পূর্ব বাংলা এবং আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠন করার প্রস্তাব দিলে অসন্তোষ দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথ প্রচুর জনসভা করেন।

১৯০৪ : বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। একটি অছি পরিষদের কাছে তিনি রিপন কলেজের মালিকানা প্রদান করেন।

১৯০৫ জুলাই ২০ : বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা। ৭ অগস্ট টাউন হলে জনসভা। তিনি কার্জনকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন 'I will un-settle the settled fact' স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা কার্যকরী হয়। সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আন্দমোহন বসু।

১৯০৬ এপ্রিল : বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে পুলিশী অত্যাচার। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সম্মেলনে। সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে আনা হলে আদালতে অবমাননার দায়ে তাকে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

১৯০৭ : কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে বয়কট আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বিভক্ত হয়। সুরেন্দ্রনাথ নরমপন্থী দলে যোগদান করেন।

১৯০৮ : স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে নির্বাসিত করা হলে তাদের মুক্তির জন্য আবেদন করেন।

১৯০৯ : লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ। মর্লে মিন্টো আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে।

১৯১০ : লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লার্ট হয়ে আসেন।

১৯১১ জুন : বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বড়লার্ট হার্ডিঞ্জের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

বাংলাদেশে ২৫টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলার প্রতিনিধি এদের স্বাক্ষর করেন। ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

২৩ ডিসেম্বর : স্ত্রীর মৃত্যু।

১৯১২ : কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

. ১৯১৩ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

মার্চ : ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগকে পৃথক করার প্রস্তাব দেন।

১৯১৪ : জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডের সভাপতিদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবার এবং প্রতিটি প্রদেশে একটি করে স্থানীয় সরকারী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব দেন।

১৯১৫ : গোখলে এবং ফিরোজ শা মেহেতার মৃত্যুতে নরমপন্থী নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়লে সুরেন্দ্রনাথের ওপর বেশি দায়ভার পড়ে।

১৯১৬ : সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। বাংলার রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হন। লক্ষ্ণৌ অধিবেশন বসে। চরমপন্থী দলের পুনঃপ্রবেশ ঘটে কংগ্রেসে। হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা হয়। এই সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশন থেকে সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অবস্থান কিছুটা হ্রাস পায়।

১৯১৭ অগস্ট ২০ : হাউস অব কমন্সে ভারত সচিব মন্টাগু ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে ক্রমশ ভারতকে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে দেওয়া হবে।

১৯১৮ জুলাই ৮ : মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের খসড়া প্রকাশিত হলে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিভেদ তীব্র আকার ধারণ করে। এই সংস্কারে বিষয় ছিল বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন। নরমপন্থীরা এই সংস্কার মেনে নিলেও চরমপন্থীরা প্রত্যাখ্যান করেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতবিরোধ দেখা দেয়। ১নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে নরমপন্থীদের পৃথক সম্মেলন হয়।

১৯১৯ : কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এক প্রতিনিধিদল ইংল্যাণ্ডে ডেপুটেশন দিতে যান। ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী বারাকপুর মহকুমার পুরসভাগুলির পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুরেন্দ্রনাথ নির্বাচিত হয়।

১৯২১ জুলাই ৪ : মন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন।

১৯২২ : উত্তরবঙ্গে বন্যা স্বচক্ষে দেখার জন্য কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে যাত্রা করেন।

১৯২৩ মার্চ ৭ : কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন গৃহীত হবার ফলে সুরেন্দ্রনাথেরই জীবনের এক স্বপ্ন বাস্তব রূপ পায়। ম্যাকেঞ্জি আইনের অবসান ঘটে। এই সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত হবার পর রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

গান্ধীজি যাকে 'বারাকপুরের ঋষি' বলেছেন, ইংরেজরা যাঁকে বলতেন সারেন্ডার-নট সেই সুরেন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে ৬ অগস্ট জাতি নির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেই বারাকপুরের মণিরামপুরের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত রেলওয়ে

ওয়াচটি চিরদিনের জন্য হারালো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিকে। বারাকপুরকে এত ভালবাসতেন যে, শেষ ট্রেন ধরেও কলকাতা থেকে বারাকপুরের বাসভবনে ফিরতেন। জীবনের শেষ দিনগুলো 'এ নেশন ইন মেকিং'-এর লেখায় মগ্ন থাকতেন এখানেই। এই বাসভবনে তার দেহাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছে স্মৃতিফলক। পাশ দিয়ে গুরুর স্পর্শ নিয়ে বয়ে চলেছে হুগলি নদী।

তথ্য সংগ্রাহক : **কানাইপদ রায়**

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী

ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাষ্ট্রগুরুর পিতা)

জগদম্বা দেবী (রাষ্ট্রগুরুর মাতা)

বারাকপুর মণিরামপুরের বাসভবনে শেষ শয্যায় রাষ্ট্রগুরু

বারাকপুর মণিরামপুরের বাসভবনে রাষ্ট্রগুরুর জীবনাবসান (৬ অগস্ট ১৯২৫)

সৌজন্য : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
ছবি : 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত

বারাকপুরের ১৫০ বছর অতিক্রান্ত রাষ্ট্রগুরুর বসত বাড়ির বাইরের অংশবিশেষ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি বিজড়িত ১২৫ বছর অতিক্রান্ত উত্তর বারাকপুর পুরসভা।
সৌজন্য : স্মরণিকা উত্তর বারাকপুর পুরসভা, এপ্রিল ১৯৯৬।
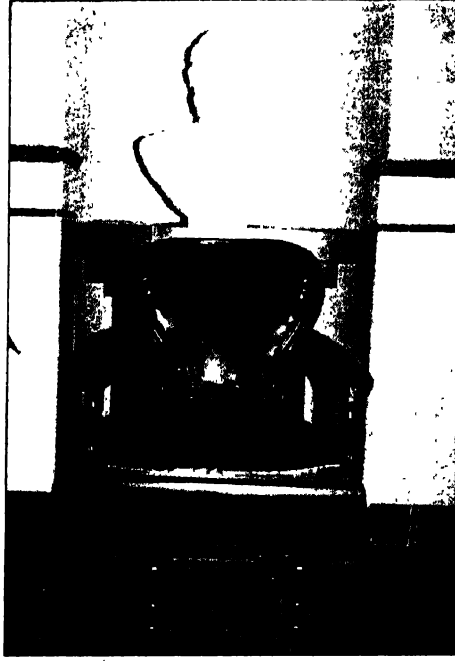
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যবহৃত চেয়ার
সৌজন্য · মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সংগ্রহালয়। ছবি : অরুণ দাস
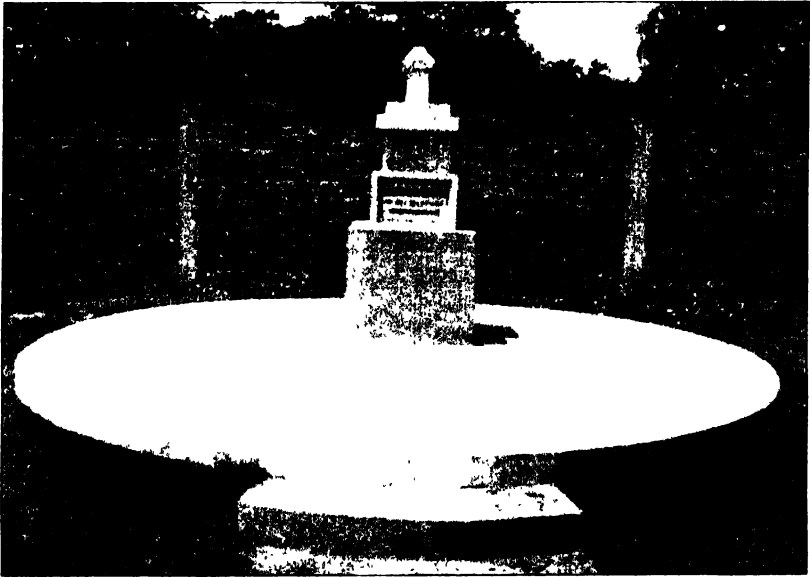
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বসতবাড়িতে রক্ষিত চিতাভস্মের উপর নির্মিত স্মৃতিফলক, মণিরামপুর, বারাকপুর
ছবি : অরুণ দাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী

বারাকপুর মহকুমায় মহাত্মা গান্ধী এবং ঐতিহাসিক আলোকচিত্রে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান

সুপ্রিয় মুন্সী

মণিরামপুরে মহাত্মাগান্ধী :

মণিরামপুরের একটি কৃতিত্ব রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ধাত্রী হওয়া। সেরকম আরও একটি কৃতিত্ব আছে—একদিন এই জনপদ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল। একজন রাষ্ট্রগুরু, অপরজন জাতির পিতা। দু'জনেই ভারতপথিক। কেবল ভারতীয় ভাবধারা, সংস্কৃতি উভয়কেই পুষ্ট করেনি, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতাজনিত গ্লানি ও কষ্ট উভয়কেই গভীরভাবে বিচলিত করেছিল ও উভয়েই নিজস্ব চিন্তা ও কার্যক্রম অনুযায়ী স্বদেশের মুক্তি ও পুনর্গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। হয়তো পথ ছিল কিছুটা পৃথক, হয়তো কারও দৃষ্টিও ছিল দেশের মধ্যে নিবদ্ধ, কারও ছিল দেশ-কালকে অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখানো। কিন্তু দু'জনেই রাজপথ ধরে হেঁটেছিলেন প্রচণ্ড সাহস নিয়ে, কর্তব্য-কর্ম যা স্থির করেছেন তারথেকে টলানো যায়নি তাঁদের, ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা সেই কাজে বাধা হয়নি কোনদিন এবং আরব্ধ কার্য সম্পাদনেই যাঁরা ক্ষান্ত হননি। আবার নতুন চিন্তা, কার্যক্রমে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় কেউ উপাধি পেয়েছেন 'সারেণ্ডার-নট' ব্যানার্জি বলে, কেউ হয়ে উঠেছেন 'মহাত্মা'। তবু পার্থক্য থেকে গেছে একটি জায়গায়—একজন চিরাচরিত পথে হেঁটেছেন, অন্যজনের অভিনবত্ব বিস্ময়কর।

মণিরামপুরে অসুস্থ রাষ্ট্রগুরুকে দেখতে আসার অনেক পূর্বেই অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির পরিচয় কংগ্রেসের আঙিনায়। কারণ সুরেন্দ্রনাথ যখন মূলত ভারতের অভ্যন্তরে 'স্বদেশী' কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত, গান্ধীজি তখন সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশবাসীগণের মর্যাদা স্থাপনের সংগ্রামে জড়িত এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনেই তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে ও গান্ধীজি তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের প্রয়োজনে তদানীন্তন অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সমর্থন ও জনমত সংগঠনে তাঁর সাহায্য চেয়েছেন। গান্ধীজির পুরোপুরিভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করে সুরেন্দ্রনাথ মুকুটহীন রাজা, যদিও অরবিন্দ ঘোষ (পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ), লোকমান্য তিলক প্রমুখ তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ও নিজেদের চরমপন্থীরূপে চিহ্নিত করেছেন, কারণ সরাসরি ইংরেজদের ভারতত্যাগ বা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাঁরা। সুরেন্দ্রনাথ মহামতি গোখলে প্রভৃতির সহায়তায় তখন ক্রমশ স্বাধিকারের প্রশ্নে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় আত্মজীবনী 'A Nation in Making'-এ গান্ধীজির 'Pas-

sive Resistance' বা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-এর কথা লিখেছেন সংগ্রামের এক নতুন হাতিয়ার হিসাবে, যদিও গান্ধীজি 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-কে দুর্বলের অস্ত্র বলে গণ্য করে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের সূচনা করেছেন— 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'— যার মূল বক্তব্য। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দু'জনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজদের স্বপক্ষে 'Recruiting Agents'—হয়তো সুরেন্দ্রনাথ বাংলায়, গান্ধীজি ইংল্যান্ডে, কারণ হয়তো তাঁরা তখনও ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ নন, হয়তো তাঁদের মনে হয়েছিল এর দ্বারা দেশবাসী বিদেশি সরকারের কাছ থেকে কিছু বদান্যতা লাভ করতে পারে। উভয়ের উভয়ের প্রতি আকর্ষণের গভীরতা এই সময়েই লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৫ সালের ১৫ মার্চ কলকাতা পুরসভা যখন গান্ধীজিকে আরও একবার সংবর্ধনা জানাল সেই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বললেন যে, "শ্রী গান্ধীর নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকালের মতন স্থান পাবে।"

পরবর্তী পর্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির পথ অনেকটাই ভিন্ন। তবু ঘটনার অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখেননি সুরেন্দ্রনাথ। ১৯২২ সালে 'অসহযোগ আন্দোলন' যখন তুঙ্গে , চৌরিচৌরার ঘটনায় বিচলিত গান্ধীজি আন্দোলনের রাশ টানায় অনেকের সঙ্গে তিনিও ক্ষুব্ধ। তারপরে গান্ধীজির কারাবাস ও অসুস্থতার কারণে বছর দুই বাদে মুক্তি।

এরপরে মণিরামপুর। অসুস্থ রাষ্ট্রগুরুকে তাঁর বাড়িতে দেখতে এলেন মহাত্মা ১৯২৫ সালের ৬ মে। অভিভূত সুরেন্দ্রনাথ আবার আসার জন্যে অনুরোধ করলেন গান্ধীজিকে। গান্ধীজিও স্বীকৃত হলেন। তাঁর এই মণিরামপুর যাত্রাকে 'তীর্থযাত্রা' আখ্যা দিয়েছেন গান্ধীজি। তাঁর সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার ১৪ মে সংখ্যায় রাষ্ট্রগুরুকে 'Sage of Barrakpore' আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন মহাত্মা। লিখলেন— "আমি শুনেছিলাম তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ও বয়স তাঁর লৌহ সদৃশ শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম ...আমি জানি একটি সময় ছিল যখন ভারতীয় যুবসম্প্রদায় তাঁর কথা আগ্রহ সহকারে শুনত।"... তাঁর নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে গান্ধীজি উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই সাক্ষাতের মাত্র মাস তিনেক বাদেই ৬ অগস্ট, ১৯২৫ তারিখে তাঁর মণিরামপুর বাসভবনে দেহরক্ষা করেন। গান্ধীজি রাষ্ট্রগুরুকে কথা দিয়েছিলেন বলে মণিরামপুর তাঁর পুনর্বার আগমনের সাক্ষী হয় ৭ অগস্ট ১৯২৫ তারিখে। এবার সঙ্গে ছিলেন বন্ধু 'দীনবন্ধু' চার্লি এন্ড্রুজ। ফিরে গিয়ে শোকাহত গান্ধীজি তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ১৩ অগস্টের সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে 'Lion of Bengal' বা বাঙলার সিংহ' আখ্যা দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রশস্তি লিখলেন। সেটি রাষ্ট্রগুরুর সারা জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞের গভীর প্রশংসনীয় মূল্যায়ন। গান্ধীজি এরপর বারাকপুরে এসেছেন, কিন্তু মণিরামপুরে আর নয়।

১৯২৫ সালের ২৪ ও ২৬ অগস্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে টিটাগড় এসেছিলেন। শহর বারাকপুরের দক্ষিণে লাগোয়া টিটাগড় অঞ্চল। ১৯৪৭ সালের ১৯ অগস্ট চানক-বারাকপুরের সদরবাজার অঞ্চলে এবং ঐদিনই কাঁচড়াপাড়ায় আসেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য।

গান্ধীজির দ্বিতীয় আবাসস্থল— সোদপুর :

গান্ধীজির সঙ্গে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল নিবিড় এবং তিনি বলতেন "সোদপুর আমার দ্বিতীয় আবাসস্থল"। বস্তুত অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব ভারতের সঙ্গে গান্ধীজির যোগসূত্র ছিল এই খাদি প্রতিষ্ঠান। খাদি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও বিভিন্ন কেন্দ্র অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গে ও বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বিস্তৃত ছিল।

মহাত্মা গান্ধী মোট আট বার এখানে এসে থেকেছেন ও নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৩৮ সালের ১০ এপ্রিল, ১৯৩৯ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে ১ মে, ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি ও অক্টোবর এবং ১৯৪৭ সালের মার্চ, মে ও অগস্ট মাসের বিভিন্ন দিনে গান্ধীজি এখানে থেকেছেন।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী :

১। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে (তখনও নেতাজি বলে পরিচিত হননি ও 'ত্রিপুরী কংগ্রেস' এর পরবর্তী পর্যায়) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও উপস্থিত ছিলেন। পরে একটি আপোষ মীমাংসার চেষ্টা হয় যাতে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও অংশগ্রহণ করেন।

২। ১৯৪৫ সালের ৩ ডিসেম্বর তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসীর সঙ্গে আলোচনা হয়।

৩। ১৯৪৬ সালের ৪ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার গঠন-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে তাঁর ১৮ দফা গঠনমূলক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন।

৪। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষে এখান থেকেই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালি (অধুনা বাংলাদেশে) যাত্রা করেন ও ১৯৪৭ সালের ৩ মার্চ এখানেই ফিরে আসেন।

৫। ১৯৪৭ সালের ১২ মে এখানে বসেই শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (মেজদাদা) ও বাংলার তদানীন্তন প্রিমিয়ার শাহেদ সুরাবর্দীর সঙ্গে 'ইউনাইটেড্ বেঙ্গল' বিষয়ে আলোচনা করেন এবং

৬। ১২ অগস্ট এখান থেকেই কলকাতার বেলেঘাটায় যান দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতায় শান্তি প্রণয়নে।

বস্তুত বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান ছিল অত্যন্ত কর্মচঞ্চল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং আত্মত্যাগী, স্বদেশপ্রেমী, বিদগ্ধ, আদর্শবান মানুষদের মিলনক্ষেত্রে ও পরামর্শাদির স্থান।

তদানীন্তন বাংলা ও ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে বারংবার এখানে এসেছেন, থেকেছেন ও সেইজন্য নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে এই মহৎ প্রতিষ্ঠান ও স্থানটি।

খাদি প্রতিষ্ঠানে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এসেছেন :

১। মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র বসু, ১২ মে ১৯৪৭। আলোচনার বিষয় ছিল— ইউনাইটেড বেঙ্গল পরিকল্পনা।

সোদপুরে গান্ধীজি ও শরৎচন্দ্র বসু ১

শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, অগ্রণী কংগ্রেস ও দেশনেতা এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মেজদাদা। ভারতের স্বাধীনতা লাভের অন্যতম শর্ত হিসাবে ১৯৪৭ সালে পুনর্বার 'বঙ্গভঙ্গ' পরিকল্পনাকে প্রতিহত করার জন্য তিনি ও তদানীন্তন বাংলার প্রিমিয়ার সুরাবর্দী সাহেব একটি 'যুক্ত-বাংলা' বা 'ইউনাইটেড্ বেঙ্গল' পরিকল্পনা করেন। এটি ভারতবর্ষের বাহিরে স্বাধীনভাবে কাজ করবে বলে তাঁরা চিন্তা করেছিলেন। গান্ধীজি শরৎ বাবুকে তাঁর সমর্থনের কথা জানান যদিও জানতেন যে দিল্লি এই বিষয়ে একমত হবে না। তবে তিনি শরৎ বসুকে বলেন যে তিনি যেন সুরাবর্দী সাহেবের কাছে খোঁজ নেন যে তাঁদের তো একটি এসেম্ব্লি হবে, সেখানে সিদ্ধান্তগুলি বিবেক অনুযায়ী হবে না সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই গ্রহণ করা হবে।

২। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে গান্ধীজির সঙ্গে এসেছিলেন মাতা ও কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯— শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ও আমাদের স্বাধীনতা লাভের অন্যতম স্থপতি। সুকণ্ঠ ও অসাধারণ বক্তৃতার জন্য ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে তিনি 'ভারতীয় নাইটিঙ্গেল' বলে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় লিখিত তাঁর কবিতা এদেশে বিদেশে খুবই খ্যাতিলাভ করে। অসম সাহসী, স্বাধীনচেতা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই জননেত্রী সম্বন্ধে গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি সর্বভারতীয় শাসনকর্তা হবার উপযুক্ত। স্বাধীন ভারতে তিনি প্রথম মহিলা গভর্নর

হিসাবে উত্তরপ্রদেশের গভর্নর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অল্পপরেই তাঁর দেহাবসান হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পশ্চিমবঙ্গের রাজপালের কার্যভার গ্রহণ করেন ১৯৬২ সালে এবং ১৯৬৭ পর্যন্ত এই কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

সোদপুরে গান্ধীজির সঙ্গে সরোজিনী নাইডু ও পদ্মজা নাইডু

মাতা ও কন্যা উভয়ের সঙ্গেই গান্ধীজির সম্পর্ক ছিল খুবই মজার, অবশ্য প্রয়োজনে গম্ভীরও। শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু গান্ধীজিকে মিকিমাউস বলতেন।

৩। মহাত্মা গান্ধী খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছিলেন পানিহাটি বিশ্রাম ঘাটে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রখ্যাত প্রচারক ও সমাজ-বিপ্লবী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৯১৫ সালে তাঁর নীলাচল বা পুরী যাত্রাকালে পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। সেইখানে তাঁর ব্যবহৃত কিছু দ্রব্যাদি সুরক্ষিত আছে। এই স্থানটি শ্রীচৈতন্যঘাট বা বিশ্রামঘাট বলেও পরিচিত। শ্রী চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানাতে ও তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি দেখতে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৬ সালের ১৮ জানুয়ারি পদব্রজে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে এখানে আসেন। গান্ধীজি এই যাত্রাকে তীর্থযাত্রা বলে অভিহিত করেছিলেন, যেমন ১৯০১ সালে কলকাতা থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে বেলুড়মঠ গিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জন্মবিপ্লবী জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী গান্ধী-শিষ্য প্রভাবতী নারায়ণ, প্রমুখ।

৪। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং আভা ও মানুগান্ধী সহ মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে ১৯৪৭ সালের ৩ মার্চ গান্ধীজি কলকাতায় ফেরেন ও সেখান থেকেই সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে আসেন। আভা গান্ধী ও মানু গান্ধীকে গান্ধীজির দুই জীবন্ত লাঠি বলা হত। প্রথম জন

৩ পানিহাটি বিশ্রামঘাটে গান্ধীজি

৬ গান্ধীজির সঙ্গে আভা ও মানু গান্ধী এবং ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ছিলেন ওঁর নাত-বৌ— ওঁর নাতি কানু গান্ধীর স্ত্রী ও দ্বিতীয় জন ওঁর নাতনি, ভাইপোর কন্যা। এঁরা দুজনেই গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালি গেছিলেন ও গুলিবিদ্ধ হবার সময়ে এঁদের কাঁধে ভর দিয়েই গান্ধীজি প্রার্থনা সভার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে, দিল্লীর বিড়লা বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন

ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যিনি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাদি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি মৌমাছি বিশেষজ্ঞ বলেও পরিচিত ছিলেন।

৫। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে আরও একবার এসেছিলেন গান্ধীজি, তাঁর দুই সচিব মহাদেব ভাই দেশাই, প্যারেলাল নায়ার এবং তাঁর ভগিনী ডাঃ শুশীলা নায়ারকে নিয়ে এপ্রিল, ১৯৩৯-এ। গান্ধীজি অত্যন্ত স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন। তিনি বলতেন যে যদি ২৪ ঘন্টাই কাজ করতে হয় তবে শরীরকে সুস্থ রাখতেই হবে। তাঁর লিখিত বইগুলির অন্যতম ছিল 'কি টু হেল্‌থ্‌' বা সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। তিনি নিয়মিত সকাল বিকাল মিলিয়ে কম করে দু ঘন্টা ভ্রমণ করতেন। উনি খুব জোরে হাঁটতেন, অনেক সময়ে হাঁটতে হাঁটতে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারভিউও দিতেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার, যিনি ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেত্রী ছিলেন ও পরে স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজি ডা. সুশীলা নায়ারের সঙ্গে। (১-৫) সৌজন্য : বারাকপুরগান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

হয়েছিলেন। তাঁর বড়দাদা প্যারেলাল নায়ার বহুদিন গান্ধীজির সচিব ছিলেন। তিনি গান্ধীজির মৃত্যুর পর কয়েকটি বৃহৎ খণ্ডে গান্ধীজির জীবনী ও চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন যা বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। এসেছিলেন গান্ধীজির প্রথম সচিব মহাদেব ভাই দেশাই যাঁকে গান্ধীজির 'বস্‌ ওয়েল' বলা হত। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি গান্ধীজির সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর সঙ্গে জেলে গেছেন ও শেষ কালে আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী থাকার সময়ে ১৫ই অগস্ট, ১৯৪২ মৃত্যুবরণ করেন। গান্ধীজির গুজরাটিতে লেখা বই ইত্যাদির ইংরেজি তর্জমা উনি করেন। যার উল্লেখযোগ্য গান্ধীজির আত্মজীবনী। গান্ধীজি ও তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধী ওঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

৬। খাদি প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুভাষচন্দ্র বসুর ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা কংগ্রেসে নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতির পদে জয়লাভের পরে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি গঠনে একটি অচলাবস্থা দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্র ২৭ ও ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৯ সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে এসে গান্ধীজি তাঁকে তাঁর মনোমত সদস্য নির্বাচনের কথা বলেন। পরে ঐ খানেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে একটি আপোষ মীমাংসার জন্য সুভাষচন্দ্রের কথাবার্তা হয়।
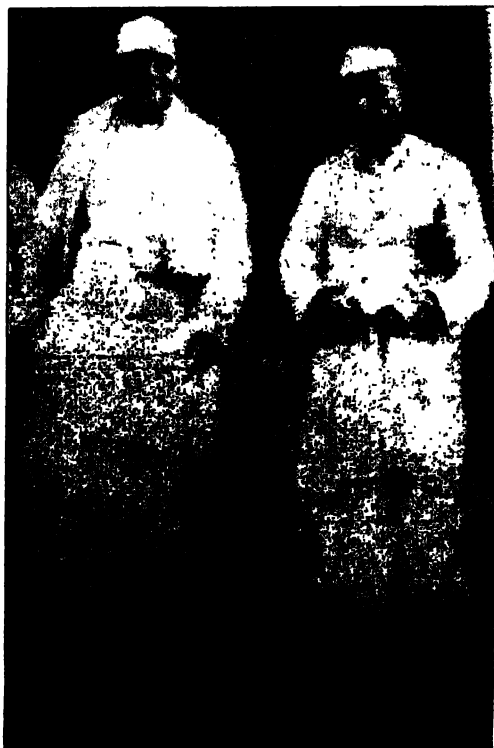
সোদপুর আশ্রমে পণ্ডিত জওহর নেহরু ও সুভাষচন্দ্র।
(ছবিটি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)

সৌজন্য : চন্দননগর পুস্তকাগার

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের গোড়ার কথা

কৃশানু ভট্টাচার্য

হুগলি নদীর তীরবর্তী বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত সোদপুর পানিহাটি বাংলার এক অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন জনপদ। শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলিতে ধন্য এই গ্রাম মহাপ্রভুর অন্যতম প্রাচীন পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রধান কর্মকেন্দ্র। ভক্তিরসের প্রাবল্যে নয় বাংলার এক উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্র এই জনপদ। জাতিভেদপ্রথা অধ্যুষিত বাংলায় আপামর জনসাধারণের একই পংক্তিতে আহারের মতো সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা সংগঠিত হয় এই জনপদেই। পুরোহিত অবশ্যই শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। মূলত তাঁরই নির্দেশে ও মহাপ্রভুর পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে দণ্ডমহোৎসবের মতো গণভোজের আয়োজন সে যুগের রক্ষণশীল বাঙালির জীবনে এনে দিয়েছিল নতুন হাওয়া। সম্ভবত সে কারণেই রমাকান্ত চক্রবর্তী নিত্যানন্দের বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যে প্রধান পাঁচটি কর্মতৎপরতার উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রথমেই উঠে এসেছে দণ্ডমহোৎসবের কথা।[১]

কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকজগতের আলোড়ন নয় সেই আলোড়নের মধ্য দিয়েই এক জটিল যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলা তথা বাঙলিকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন যুগপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরহংসদেব। একাধিকবার এই জনপদে তিনি এসেছেন। শুধু আসাই নয়, নবদ্বীপ গোস্বামীর মতো বৈষ্ণব ধর্মগুরুকে দণ্ডমহোৎসবের আসরে বসে উপদেশ দিয়েছেন ধর্মপ্রচার করার মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষা দিতে হবে।[২] বাংলার এই প্রাচীন জনপদ দুই যুগপুরুষের পদস্পর্শে ধন্য। প্রাচীনত্বর জন্যই নয়, সামাজিক পরিবর্তনের নিরিখে বাংলার সামাজিক জীবনে এর গুরুত্ব কম নয়।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী বাংলার আর্থিক বনিয়াদকে দৃঢ় করার যে প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল তাতেও এই অঞ্চল উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব পেল। সে কর্মযজ্ঞের অন্যতম প্রধান পুরোহিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি এখানেই স্থাপন করেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্যতম প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। বিস্তীর্ন এলাকার উপর অবস্থিত এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের পথ ধরেই এখানে গড়ে উঠেছিল বাঙালির বিত্তসাধনার নিত্যনতুন উদ্যোগ বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ, বঙ্গোদয়, বাসন্তী কিংবা বঙ্গশ্রী'র মতো কাপড়ের কল, চশমার কাচ তৈরির কারখানা, সিগারেট তৈরির কল, নানাধরণের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা। এককথায় বাংলার বিশেষ করে হুগলি শিল্পাঞ্চলে এই জনপদ আদায় করে নিল প্রত্যাশিত গুরুত্ব, কাজেই পরবর্তী পর্বে জাতীয় রাজনীতির নানা পটপরিবর্তনের কেন্দ্র হিসাবে এই জনপদ নিজস্ব গুরুত্ব অর্জন করে নিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই জনপদের সর্বভারতীয় গুরুত্ব অর্জনে যে ব্যক্তির উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বাংলায় গান্ধীজির অস্থায়ী আবাস

হিসাবে সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ছিল সর্বভারতীয় স্তরেও। সম্ভবত কলকাতার অতি নিকটেই অবস্থিত হয়ে এক গ্রামসুলভ পরিবেশের জন্য গান্ধীজির এই এলাকার উপর বিশেষ আর্কষণ জন্মে যায়। আর এই কাজের জন্য যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। পরবর্তী সময়ে নিজ জীবনের কর্মনিষ্ঠা আর নিজ লক্ষ্যে অবিচল থাকার কারণেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'সোদপুরের গান্ধী' হিসাবে। গান্ধীজির মতে, "নেতা দুই শ্রেণির হয়ে থাকে। এক, যারা 'আপনি মোড়ল'— এরা জনগণকে শোষণ করবার জন্য নেতা হয়, আর দ্বিতীয় যারা জনগণের সেবা করার অধিকারে নেতা হয়। এরা বিশ্বস্ত মানুষ। এই দুই জাতের লোককে সহজেই চেনা যায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের জনসাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায় না। সতীশচন্দ্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ।"[৩]

সতীশচন্দ্র কিন্তু আদতে পানিহাটির বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁর জন্ম হয় উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে। সম্ভবত তিনি ১৮৮১তে জন্মগ্রহন করেন, সতীশচন্দ্রের শিক্ষাজীবন কাটে কোচবিহার ও পরে কলকাতায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র সতীশচন্দ্র ১৯০১-এ স্নাতক হয়ে ১৯০২ তে যোগ দেন বেঙ্গল কেমিক্যালে, সেই বছরেই তাঁর সঙ্গে যোগ দেন তাঁরই সহপাঠী রাজশেখর বসু, কর্মসূত্রেই সতীশচন্দ্র ও রাজশেখরের সোদপুরে আগমন, পরবর্তী জীবনে সতীশচন্দ্র ৬৪ বছর কাটিয়ে ছিলেন এখানেই। সোদপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হল। জীবনের শেষ ১৫ বছর শতায়ু এই কর্মযোগী বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গোগরায় রুক্ষ্ম জমিকেশস্য-শ্যামল করার ব্রত নিয়ে অসাধ্যসাধন করলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের ২০ বছরের কর্মজীবনে নানাধরনের নতুন ধরনের উদ্ভাবনের জন্য পেশাগত জগতে তিনি ছিলেন বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। তাঁরই আবিস্কৃত অগ্নি নির্বাপক 'ফায়ার কিং' তাঁর সংস্থাকে এনে দিয়েছিল আর্থিক সমৃদ্ধি। পরবর্তী জীবনে খাদি ও গ্রামোদ্যোগের প্রসারেও তাঁর নিত্য নতুন উদ্ভাবন দেশে আলোড়ন তুলেছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সস্তা অথচ টেকসই বিশেষ ধরনের চরখা। এই সম্পর্কে গান্ধীজির মন্তব্য ছিল, "বাংলায় অত্যন্ত সস্তা ও সুন্দর চরখা পাওয়া যায়। খাদি প্রতিষ্ঠান একটি চরখা তৈরি করে। এক একটির দাম দু-টাকা আট আনা। আমি চাই সমগ্র বাংলা দেশে এই চরখা প্রর্বতিত হোক।[৪]

আর স্বাধীনভারতে কৃষি গবেষণায় তাঁর ব্যতিক্রমী প্রয়াস প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ এম. এস. স্বামীনাথনের মন্তব্য, "ওঁর অভিধানে অসম্ভব শব্দ বোধহয় নেই"।[৫]

অন্যদিকে লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন সমানভাবেই সচল, তাঁর শেষজীবনের রচনা 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' মননেই সমৃদ্ধ নয়, তথ্য ও ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণের জন্য আজও সমানভাবে সুখপাঠ্য। ১৯৭৯ এর ২৪ ডিসেম্বর তাঁর এই কর্মজীবনের সমাপ্তি হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন কর্মক্ষম। এই কর্মযোগীর জীবন প্রমাণ করে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা একটি মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে।[৬]

রসায়নশাস্ত্রের ছাত্র এবং সচেতন বিজ্ঞানকর্মী সতীশচন্দ্রের জীবনে খাদি ও গ্রামোদ্যোগের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হওয়া ছিল একান্তই দুর্ঘটনা। কারণ জীবনের প্রথম ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত তাঁর স্বপ্ন ছিল শিক্ষাগুরুর প্রতিষ্ঠানকে এশিয়ার বৃহত্তম রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়া। ১৯৬৩-তে খাদি প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উপর তৈরি একটি গোপনীয় প্রতিবেদনে তিনি এই ধরনের বাসনার কথাই উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক শ্রীমতী মারিয়া প্রায়া বাংলার গান্ধীবাদীদের উপর তাঁর বিস্তৃত গবেষণাকর্মের মধ্যে এই

গোপনীয় প্রতিবেদনটির নানা উল্লেখযোগ্য বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন। সতীশচন্দ্র লিখছেন, "সেটা ১৯২১ সাল, আমি সেসময় বেঙ্গল কেমিক্যালের সম্প্রসারণের যে কাজ চলছে তার সঙ্গে যুক্ত। আমি নিজের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম যে আমরা সকলে মিলে একে এশিয়ার বৃহত্তম রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব। এমনকি আমরা জাপানকেও ছাপিয়ে যাব। সে সময় জাপান এই শিল্পে বিশ্বে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল।"[৭]

এই ধরনের অবিচল ও দৃঢ় লক্ষ্য থেকে কুটির শিল্পের প্রতি তাঁর আর্কষণের পিছনেও ছিল বাণিজ্যিক জগতের নানা সমস্য। আসলে ভারী শিল্পের বিপণনের সঙ্গে যুক্ত থাকে যে অসাধুতা ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা তাতে তিনি রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন।[৮] তখনই গান্ধীজির প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়। নিজের অতীত দিনের রোমন্থণ করতে গিয়ে সতীশচন্দ্র বলেছেন, "গান্ধীজিকে বলি যে, তোমার কাজ করিব, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস ছাড়িব। তিনি বলিলেন কদাচ নয়, আচার্য রায়ের সহিত মহান কার্য করিতেছ, করিতে থাক, ঠিক কথা"[৯] অন্যদিকে কেমিক্যালের সহকর্মীরা তাকে ছাড়তে নারাজ। তিনি তখন কারখানার মধ্যেই বাস করেন। এক রাতে কাউকে কিছু না বলে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কারখানা ছেড়ে চলে গেলেন ভাড়াবাড়িতে। সকালে খবর পাঠালেন, তিনি আর ফিরছেন না। তার ব্যবহৃত আসবাব ও জিনিষ যেন নতুন বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁর কাছে 'অসহ্য' হয়ে উঠছিল।[১০]

সতীশচন্দ্রের জীবনের এই ধরনের পরিবর্তনের সূত্রপাত ১৯২১। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় পর্ব ছিল কিছুটা অস্বস্তিকর। কলকাতাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে তিলক স্বরাজ তহবিলের জন্য গান্ধীজির এক সভায় উপস্থিত ছিলেন সতীশচন্দ্রের স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী। গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে দিন হেমপ্রভা দেবী হাতের সোনার বালা জমা দেন। ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সতীশচন্দ্র।[১১] কিন্তু এই প্রাথমিক বিরাগ ধীরে ধীরে অনুরাগে পরিণত হল। কারণ কর্মজগতের জটিলতা তাঁকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। সেইসময় গান্ধীজির কাজ ও কথার সারল্য তার মনে গভীর রেখাপাত করে। "এই মানুষটিকে তখনও দেখি নাই, কিন্তু আত্মসর্মপন করিয়া ফেলি। চরখার উন্মাদনা উপস্থিত হয়। এই তো কাজ, এই কাজ করিব। বেঙ্গল কেমিক্যাল কর্মীদের মধ্যে চরখার প্রর্বতন করি।"[১২]

আচার্য রায়ের অনুমোদনক্রমে তিনি ও রাজশেখর বসু মানিকতলাতে বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মীদের মধ্যে চরখার প্রর্বতন করলেন। ১৯২১-এ তিনি লিখে ফেললেন একটি বই, নাম 'চরকা'। এর মুখবন্ধ লিখলেন আচার্য রায়।[১৩] এবারে পরীক্ষা চলল খদ্দরে রং করার পদ্ধতি নিয়ে। রাজশেখর ও সতীশচন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে, সে পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হল। বেরোল বই 'দেশি রং'। এক কথায় রাসায়নিক শিল্পের অঙ্গনেই চরখা ও কুটিরশিল্পের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হল।[১৪]

গান্ধীজির সঙ্গে এই পর্বেই তাঁর পরিচয় আরও নিবিড় হল। ১৯২৩-এ কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কোকনদে। সেখানেই একই সময় আয়োজিতহল সর্বভারতীয় খদ্দর প্রদর্শনী। উদ্বোধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভাষণে আচার্য রায় তথ্য দিয়ে দেখালেন কিভাবে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার এদেশের নিজস্ব শিল্পকে নষ্ট করেছে। সতীশচন্দ্র সে সময় আচার্যদেবের সঙ্গী। নিবিড়ভাবে আলোচনা হল গান্ধীজির সঙ্গে। বুঝলেন চরখা নতুন ভারত নির্মাণের এক উল্লেখয়োগ্য হাতিয়ার কিভাবে হতে পারে। এরই কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে এসে তিনি

বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরি ছেড়ে দিলেন।[১৫]

১৯২৫-এর ২৫ জুন খাদি প্রতিষ্ঠান একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। আচার্য প্রফল্লচন্দ্র সভাপতি আর সচিব সতীশচন্দ্র।[১৬] দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠান বাংলার বিভিন্ন স্থান যেমন ফেনী, আত্রাই, তাঁলোরা, সুখিয়া ও রাজসাহীতে শাখাবিস্তার করল। ইতিমধ্যে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে। হেমপ্রভা দেবী পুত্রদের নিয়ে সেবাগ্রামে বাস করে এসেছেন। ঘুরে এসেছেন সতীশচন্দ্রও।

এরমধ্যে ১৯২৪-এ কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন গান্ধীজি। কংগ্রেস উপলক্ষে নানাধরেণের কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে। গান্ধীজি আমন্ত্রণ জানালেন সতীশচন্দ্রকে। ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে দেখাতে হবে কি ভাবে ব্রিটিশরা এদেশের শিল্পকে ধ্বংস করল।[১৭] 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাতে 'বেলগাও'র স্মৃতি শীর্ষক রচনাতে গান্ধীজি মন্তব্য করলেন, "সতীশবাবুর চিন্তাদীপ্ত ভাষণের জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য। যে সুন্দরভাবে তিনি নিজের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে আর্কষণীয় ও চিন্তা উদ্রেককারী।[১৮]

সতীশচন্দ্রের চিন্তাভবনা গান্ধীজিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯২৫-এর ৮ জানুয়ারি প্রতিটি প্রদেশ কমিটির প্রতি কংগ্রেস সভাপতিনির্দেশের মধ্যে। সেই নির্দেশে রাষ্ট্রপতি গান্ধী সতীশচন্দ্রের লিখিত দুইটি বই পড়ে নিজেদের কাজ পরিচালনার পরামর্শ দিলেন। প্রথম বইটিতে লেখা ছিল কিভাবে সুতা কাটা, বয়ন সহ বিভিন্ন কাজ সংগঠিত করতে হবে আর দ্বিতীয় বইটিতে বিবরণ ছিল বিভিন্ন ধরণের সুতার। দুইটি বইয়ের দাম ছিল তিনটাকা।[১৯] কংগ্রেসের সাবজেক্ট কমিটির বৈঠকেও রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে সতীশবাবুর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।[২০]

১৯২৫-এ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা সফরের কর্মসূচি নিলেন গান্ধীজি। সতীশচন্দ্র তখন বাংলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। মে-জুন মাসে কংগ্রেস সভাপতির এই জেলাওয়াড়ি সফরের প্রতিটি পদেই সতীশচন্দ্র সঙ্গী হলেন। পরিচালনা করলেন যাত্রাপথের প্রতিটি কাজ। সতীশচন্দ্রের কাজের প্রতি গান্ধীজির অনুরাগ সে সময় কতটা প্রবল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় গুজরাটি ভাষায় লেখা 'নবজীবন' পত্রিকাতে তাঁর একটি রচনাতে। রচনাটির শিরোনাম 'বাংলার আত্মত্যাগ'। দীর্ঘ প্রবন্ধের বিষয় সতীশচন্দ্র এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান।

গান্ধীজি লিখেছেন, "সতীশবাবু মাসে ১৫০০ টাকা বেতনের চাকরি করতেন। তাঁর বসবাসের জন্যে তিনি বাংলো পেতেন। বর্তমানে চাকরি ছেড়ে তিনি জমা অর্থে সংসার প্রতিপালন করেন আর ২৪ ঘন্টা খাদির কাজ করেন। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ১২টি শাখা আছে। এর মধ্যে পাঁচটিতে বর্তমানে উৎপাদন হয়। ৫৯৭টি হ্যান্ডলুম পরিচালিত হয়। এদের সুতো আসে ৫০৬০টি চরখা থেকে।" দীর্ঘ নিবন্ধের শেষে গান্ধীজির হতাশাও গোপন থাকেনি। বাংলার মানুষদের এহেন আত্মত্যাগের পাশে তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটে খাদি আন্দোলন পরিচালনাতে আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় তিনি হতাশা প্রকাশ করেছেন।[২১]

খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্যই ১৯২৫-এ বেঙ্গল কেমিক্যাল পানিহাটি কারখানার কাছেই সতীশচন্দ্র ৩৪ বিঘা জমি সংগ্রহ করেছিলেন। এই জমির পূর্ব সীমানাতে ছিল সোদপুর রেলস্টেশন, পশ্চিম সীমানায় ও দক্ষিণ সীমানায় ছিল বাগান আর উত্তর সীমানায় রাস্তা যা বর্তমানে সোদপুর স্টেশন রোড। ১৯২৭-এ প্রথম সেই আশ্রমে গান্ধীজির পায়ের ধুলি পড়ল। কোলাহল বর্জিত এ হেন পরিবেশে তাঁরই আদর্শে নিবেদিত একদল

মানুষের কাজ তাঁকে প্রথম দিনেই মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি এই ভবনটিকে বলতেন তাঁর 'দ্বিতীয় বাসভূমি'।

১৯২৬-র ৩০ ডিসেম্বর তিনি গৌহাটিতে কংগ্রেসের আধিবেশনে যোগ দিয়ে আসাম মেলে কলকাতায় আসেন ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হন। ঐ সময় তিনি দেশবন্ধুর বাসগৃহে চিত্তরঞ্জন সেবা প্রতিষ্ঠান নামের একটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯২৭-এর ২ জানুয়ারি সোদপুরের আশ্রমের কলাশালার উদ্বোধন করেন। গান্ধীজির জীবনীকার ডি. জি. তেন্ডুলকর মন্তব্য করেছেন যে, নয় মাস সময়ের মধ্যে সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করে তিরিশ বিঘা জমির উপর এই সুদৃশ্য আশ্রমটি গড়ে তোলা হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।[২২]

কলাশালার উদ্বোধন করে গান্ধীজি বলেছিলেন, ''আপনারা দেখছেন কিভাবে নিজের সব পণ করে সতীশবাবু খাদির উন্নতি করছেন। আপনাদের অনেকেরই একথা মনে হতে পারে যে সতীশবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বলব যে, যে বিশ্বাসের জোরে পর্বতকে স্থানচ্যুত করা যায় সতীশবাবুর খাদির প্রতি সেই ধরণের বিশ্বাস রয়েছে। তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি কলকাতার বাজারে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশি বস্ত্র আমদানি হয় তা বন্ধ করতে পারবেন।''[২৩] গান্ধীজির এই ধরনের মর্মস্পর্শী ভাষনের পর উপস্থিত জনসাধারণ ৫০০টাকা খাদি তহবিলে জমা দেন। আরও ৩০০০ টাকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতে এই ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এরমধ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকাতে প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ছয়টি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। সেই আলোকচিত্রগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মূল প্রবেশদ্বারটি সাঁচীস্তূপের তোরণের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যারাক বাড়ির মত কয়েকটি বাড়ি ছিল। এরমধ্যে একটি ছিল রন্ধনশালা, একটি কর্মীদের আবাসগৃহ। গান্ধীজি যে অংশটির উদ্বোধন করেছিলেন সেটি একটি পাকা গৃহ। বর্ত মানে প্রতিষ্ঠানের এই গৃহটিই রয়েছে। বাকি গৃহের মধ্যে এইটি বাদ দিয়ে চিকিৎসাবিভাগের গৃহটি রয়েছে।

'প্রবাসী' পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রকাশ, ''গত ১৮ পৌষ মহাত্মা গান্ধী সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান কলাশালার দ্বারোদঘাটন করেন। এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাস্থলে শৃঙ্খলারক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সমুদয় স্থানটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

সোদপুর কলাশালার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধীয় সমুদয় কাজ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা চলিতেছে। এইসব যন্ত্রের অধিকাংশ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক পরিকল্পিত। ... যে কারখানায় যন্ত্রের ও বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার আছে এবং এত বেশি পরিমাণে আছে, তাহার দ্বারোদ্ঘাটন মহাত্মা গান্ধী করায়, এই অনুমান করা যাইতে পারে, যে, তিনি যন্ত্র বলিয়াই যন্ত্রের ব্যাবহারের বিরোধী নহেন এবং যদি কেহ সুতা কাটিবার এরূপ সস্তা যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারেন যাহা ক্রয় করা ও ব্যবহার করা কুটিরবাসি গ্রাম্য দরিদ্র লোকেদেরও সাধ্যায়াত্ত, তাহা হইলে তাহার ব্যবহারে তাঁহার আপত্তি হইবে না, কারণ, তাহা ব্যবহার করিলে গরিব কাটুনীদের উপার্জন বাড়িবে। অল্প শ্রমে ও সময়ে অধিক উপার্জন হইলে তাহারা অবসর সময়ে জ্ঞানোপার্জন ও ধর্ম চিন্তা করিতে পারিবে।

খদ্দরের বিস্তৃত প্রচলন আমরা সর্বান্তকরণে চাই। সেই জন্য ইহাও আমরা ইচ্ছা করি যে, খাদি প্রতিষ্ঠান এবং অন্য যাহার খদ্দর বয়ন করেন, তাঁহাদের প্রস্তুত বস্ত্র আরও উৎকৃষ্ট ও সস্তা হউক। তাহা হইলে উহা সর্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারিবে।''[২৪]

১৯২৭-এর জানুয়ারিতে সোদপুর থেকে গান্ধীজি যাত্রা করেন কুমিল্লা জেলাতে। সেখানে তিনি অভয় আশ্রমে বেশ কয়েকদিন বাস করেন। এই আশ্রমের অধীনে তখন অস্পৃশ্য বালক বালিকাদের সাতটি বিদ্যালয় ছিল। এছাড়া এরা গরীব গ্রামবাসীদের চিকিৎসার বিষয়ে সাহায্য করতেন।[২৫]

আশ্রমে একদিন প্রার্থনাসভায় অভয় আশ্রমের পরিচালক ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ''আপনারা পথপ্রদর্শক, আপনারা যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী। আপনারা দুইটি জলধারার জন্ম দিন। আমি আপনাদের একটি ছবি কল্পনা করতে পারি। দুটি তেজি ঘোড়া খদ্দরের রথকে দ্রুতগতিতে টেনে নিয়ে চলেছে। আপনারা ইতিমধ্যেই বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। কারণ আপনারা আপনাদের কাজের জন্য অন্য কারো সাহায্যের প্রতি বিশেষ নির্ভরশীল নন। আপনারা দেশের মহিলাদের নিজেদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাদের সম্মান দিয়েছেন। তারাও খদ্দর পরিধান করে গর্বিত। আসুন আমাদের প্রত্যেকের শক্তি ও দুর্বলতা অন্যদেরও শক্তি ও দুর্বলতার সঙ্গে মিশে সকলকে শক্তিশালী করুক। খাদি প্রতিষ্ঠান ও অভয় আশ্রম একত্রে কাজ করে সমস্ত সংকটকে মোকাবিলা করুক।''[২৬]

১৯২৭-এর পর দুই বছর কেটে গেলেও গান্ধীজি সোদপুরে এলেন না। যদিও সতীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নী হেমপ্রভা দেবীর সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সতীশচন্দ্র সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ করে পূর্বভারতে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বিস্তারে মহাত্মপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু সেইসব কাজের প্রধান কেন্দ্রে গান্ধীজির অনুপস্থিতি তাঁদের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছিল। ব্যাকুল সতীশচন্দ্র একটি পত্রে গান্ধীজিকে সেই বেদনার কথাই প্রকাশ করলেন। লিখলেন, ''হেমপ্রভা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়। অথচ তাঁর শরীরও সেবাগ্রামে যাওয়ার উপযুক্ত নেই। তাই সে ও আমরা সকলে চাই আপনি এখানে আসুন। সোদপুরে এসে একে আপনি আপনার নিজের বাড়ির মতো ব্যবহার করুন। এখানকার প্রতিটি সদস্যদের মানসিক অবস্থা আপনার সাহচর্যে উন্নত হোক।''[২৭]

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯-এ সবরমতীর সত্যাগ্রহ আশ্রম থেকে গান্ধীজি সতীশচন্দ্রকে জানালেন ১ মার্চ তিনি রওনা দেবেন। ৩ অথবা ৪ মার্চ সকালে পৌঁছবেন কলকাতায়। ৫ মার্চ যাবেন রেঙ্গুন। মার্চের শেষ সপ্তাহে ফিরবেন কলকাতায় ও সেখান থেকে দিল্লি যাবেন।[২৮]

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯-এ অন্ধ্রপ্রদেশের কর্মী কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়াকে জানালেন ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি সবরমতীতে থাকছেন না। সে সময় দিল্লী, কলকাতা ও রেঙ্গুনে থাকবেন। কলকাতাতে তাঁর অস্থায়ী আবাসের ঠিকানা হিসাবে জানালেন, সোদপুর প্রযত্নে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, খাদি প্রতিষ্ঠান।[২৯]

সবরমতী থেকে কলকাতাতে আসার পথে ১৫ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগ দিলেন। সেখানে বিদেশি বস্ত্র বয়কটের কর্মসূচি গৃহীত হল। কলকাতা আসার পথে দিল্লিতে তিনি সাংবাদিকদের বললেন, ''আমি মনে করি অনুনয় বিনয় নয়, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বয়কটের সিদ্ধান্ত জরুরি ভিত্তিতে প্রচার করতে হবে।''[৩০]

৩ মার্চ রাতে তিনি কলকাতায় আসেন ও সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে বাস করেন। ৪ তারিখ বিকালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় তিনি বলেন বয়কটের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত। তিনি বয়কট কমিটির প্রধান হিসাবে সর্বত্র এই বার্তা পৌঁছে দিতে এসেছেন। তবে জনসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তায় এই বিদেশি বস্ত্র পোড়ানো যাবে না। তা হবে আইনবিরুদ্ধ। কিন্তু শ্রদ্ধানন্দ পার্ক কোনো সাধারণের ব্যবহারের স্থান নয়। এখানে কোনো ধরনের বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর আয়োজন আইনবিরুদ্ধ হবে না। তিনি আরও বলেন, এখানে কোনো ধরনের ঘটনার জন্য কারো যদি শাস্তি হয় তবে তা হবে তাঁর। কারণ এখানে তাঁরই নির্দেশে জনতা বিদেশি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করছেন। "আপনারা অগ্নিসংযোগ করছেন না, অগ্নিসংযোগ করছি আমি। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। এই কর্মসূচি কোন প্রতিরোধের কর্মসূচি নয়, এটা বয়কটের কর্মসূচি।"[৩১]

গান্ধীজির এই ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা আগুনে বিদেশি বস্ত্র নিক্ষিপ্ত করতে শুরু করে। ৫ মার্চ সোদপুরে হাজির হলেন ব্রিটিশ বাহিনী। উদ্দেশ্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা। কিন্তু ঐ দিন তাঁর ব্রহ্মদেশে যাবার কথা। তাই ব্যক্তিগত জামিনে তাকে মুক্ত করা হয়। ৫ মার্চ তিনি রেঙ্গুনে গেলেন।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে ২৪ মার্চ কলকাতার হলিডে পার্কে তিনি এক সভায় বক্তব্য রাখেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধীজির আহ্বানে প্রচুর বিদেশি বস্ত্র ঐ স্থানে জমা করা হয়। পরে ঐ বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়।[৩২]

কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ২৭ মার্চ শ্রদ্ধানন্দ পার্ক-এর ৪ মার্চ সভার জন্য গান্ধীজিকে দোষী সাবাস্ত করা হয়। রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজি সহ চারজনকে এক টাকা জরিমানা করেন। গান্ধীজির অনুমোদন ছাড়াই জনৈক শুভানুধ্যায়ী ঐ টাকা জমা দেওয়াতে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, যে টাকা জমা দিয়েছে সে আমার বন্ধু নয়। কারণ আদালতের রায়ে আমি সন্তুষ্ট নই। বয়কট আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেভাবে পুলিশী হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তাতে আমি বিচলিত।"[৩৩] তবে যে দিন গান্ধীজির জরিমানা দেবার আদেশ দেওয়া হয় সে দিনই ঐ রায়ের প্রতিবাদে সর্বত্র বিদেশি বস্ত্রে আগ্নিসংযোগ করা হয়। ২৭ মার্চ তিনি দিল্লিতে ফিরে যান।

এরপর প্রায় আট বছরের বিরতি। ১৯৩৭ এর এপ্রিল মাসে গান্ধীজি কলকাতায় আসেন। সেবারে তিনি মূলত কলকাতায় শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে ছিলেন। তবে ১০ এপ্রিল কিছু সময়ের জন্য এসেছিলেন খাদি প্রতিষ্ঠানে। ১৪ই এপ্রিল ফিরে যান দিল্লিতে।

এরপরের সোদপুরে আগমন কয়েকটি ঘটনার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।১৯৩৯-এর ৩১ জানুয়ারি কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলেন। গান্ধীপন্থী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্রের এই জয়লাভ গান্ধী ঘনিষ্ঠ নেতারা সুনজরে দেখলেন না। গান্ধীজিও ঐ দিন যে বিবৃতি দিলেন তার পরবর্তীকালে নানা ধরনের ব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট নাও হতে পারেন। যদি তারা বর্তমান গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারেন তবে তারা কংগ্রেসের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন। যদি কেউ বর্তমানে (সুভাষবাবুর জন্য) অস্বস্তি বোধ করেন তবে তিনি কংগ্রেসের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন তবে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তাঁকে

দেশের জন্য এর থেকেও কোন বড় কাজের শরিক হতে হবে।"৩৪

১০ মার্চ ত্রিপুরায় প্রকাশ্য অধিবেশন হল। এর আগে ওয়ার্ধাতে ২২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা বসার কথা হয়। সে সভায় অসুস্থতার জন্য সুভাষ উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতেও নানা কারণ দেখিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য পদত্যাগ করলেন। এদের সঙ্গে পরে যোগ দিলেন পণ্ডিত নেহেরু। এছাড়াও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ত্রিপুরী কংগ্রেসে ৭ মার্চ প্রস্তাব দিলেন যে, "যেহেতু দেশের আগামী দিনের আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব খুবই জরুরি সেই কারণেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের আগে কংগ্রেস সভাপতির কাজ হবে গান্ধীজির অনুমোদন নেওয়া।"৩৫ এ প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হল।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সাধারণ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত মতো সুভাষচন্দ্র এই বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। সুভাষচন্দ্রের পত্রের উত্তরে গান্ধীজি লিখেছিলেন, "আমি যতই ইহা (পন্থ প্রস্তাব) পড়ি ততই ইহা অপছন্দ করি। রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। কিন্তু বর্তমান সমস্যাগুলির উত্তর ইহাতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তোমার উচিত ইহা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করা এবং সামান্যমাত্র দ্বিধা না রাখিয়া তদনুসারে কাজ করা। আমি তোমার উপর জোর করিয়া ক্যাবিনেট চাপাতে পারি না এবং তাহা চাপাইব না। চাপানো ক্যাবিনেট তোমার মানিয়া লওয়া উচিত নয় কিংবা আমি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক তোমার ক্যাবিনেট ও নীতির অনুমোদন সম্বন্ধে গ্যারান্টিদিতে পারি না। ইহার অর্থ হইবে মতের অবদমন। সদস্যগণ নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করুন।"৩৬

সুভাষচন্দ্র অবশ্য ও বিষয়ে সামনাসামনি কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন অসুস্থ, গান্ধীজিও সুস্থ নন। এর উপর রাজকোট ও দিল্লির পরিস্থিতির জটিলতার জন্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজির অনুমোদনে সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের দিন স্থির করলেন। ১৪ এপ্রিল, তার যোগে গান্ধীজি জানালেন, "তোমার তার পাইলাম, গান্ধী সেবা সংঘ ৩ মে হইতে ১০ মে। ওয়ার্কিং কমিটি এ মাসের ২৮ তারিখ ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ২৯ তারিখে হইলে ভাল হয়। যোগ দিতে মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিব। —জ্বর কমিয়াছে। বিপদের আশংকা নাই।"৩৭

উত্তরে সুভাষচন্দ্র ঐ বৈঠকে গান্ধীজির উপস্থিতি কতটা জরুরি তা তার যোগে জানালেন। "গতকাল আপনার উভয় তারবার্তা পাইলাম। দুঃখের বিষয়, আপনার কলকাতা আসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় আপনার উপস্থিতি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। ... আপনাকে তেরো তারিখে পত্র দিয়াছিলাম। আজ আবার পত্র লিখিতেছি যদি কোনো কারণে আপনি ক্যাবিনেট মনোনয়ন না করেন তাহা হইলে অমীমাংসিত অবস্থায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে উত্থাপিত হইবে। তাহার পূর্বে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে মীমাংসায় উপনীত হইবার শেষ চেষ্টা আমাদের করা উচিত।"৩৮

১৯ এপ্রিল গান্ধীজি রাজকোট থেকে তারবার্তায় জানালেন যে, আমি সুনিশ্চিতভাবে চব্বিশ তারিখে রওনা হইয়া সাতাশ তারিখ সকালে কলিকাতা পৌছাইব। আমি সোদপুরে থাকিতে পারি। হেমপ্রভা দেবী বরাবর সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। চিকিৎসকদের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ডা. রায় অন্য পরামর্শ দিয়াছেন।"৩৯

তারবার্তার উত্তরে সুভাষচন্দ্র লিখলেন যে, "আপনি ২৯ তারিখ কলিকাতায় আসিতেছেন জানিয়া বিশেষ খুশি হইলাম। আপনার পছন্দমতো স্থানে থাকা সম্বন্ধে আপত্তি নাই। ... যাহা হউক, সতীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুনরায় কলিকাতা হইতে আপনাকে তার করিব।"[৪০]

শেষপর্যন্ত স্থির হল গান্ধীজি ঐ ক'দিন সোদপুরেই থাকবেন। ২৪ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র জানালেন, "সতীশবাবুর সহিত আলোচনা করিলাম এবং সেখানে শান্ত পরিবেশে আপনার অবস্থান অনুমোদিত হইল, সুতরাং পথে যাত্রা বিরতির কোনো প্রয়োজন নাই।"[৪১]

কথামত ২৭ এপ্রিল সকাল দশটায় গান্ধীজি সোদপুরে এলেন, শুরু হল আলোচনা, আলোচনায় যোগ দিলেন জওহরলাল, ২৮ এপ্রিল সকাল ৮টার সময় কলকাতা থেকেআবার সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল সোদপুরে এলেন। কোন ঐক্যমতে আসা সম্ভব হল না, ২৯ এপ্রিল সকালেও বৈঠক হল। কিন্তু সেদিনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল না। সংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেষবারের মত কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সোদপুরে সুভাষচন্দ্র জানালেন সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে একটি খামে।[৪২]

ঐ দিন বিকালে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বললেন, "মহাত্মাজি কলকাতার আসার পর তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ বাক্যালাপ হয়েছে। তিনি বলেছেন আমি নিজের পছন্দমত ব্যক্তিদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি। সে কমিটিতে পুরনো ওয়ার্কিং কমিটির যারা পদত্যাগ করেছেন তাদের নেবার দরকার নেই। কিন্তু সে প্রস্তাবে সহমত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ তা ছিল পন্থ প্রস্তাবের বিরোধী। কারণ এই কমিটি সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজির অনুমোদিত তা বলা যাবে না।"[৪৩]

এই পরিস্থিতিতে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সুযোগ দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন।[৪৪]

সোদপুরের এই ঐতিহাসিক বৈঠকের এক অন্য ধরণের স্মৃতি রয়েছে সতীশচন্দ্রের ভ্রাতুস্পুত্র বরুন দাশগুপ্তের স্মৃতিতে। "সোদপুরে এলে গান্ধীজি বরাবর যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা অনেকটা ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের আকারের মত ছিল। 'ইউ'-এর দুই পাশে ছিল আড়াআড়ি বাঁকা। আর মাঝখানটার মেঝে ও দেওয়াল পাকা কিন্তু ছাদটা টালির। বাঁ পাশের অংশের প্রথম ও বড় ঘরটাতে গান্ধীজি থাকতেন। একটা লম্বা বারান্দা বাড়িটার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর বাঁ পাশের শেষ প্রান্তে ছিল বাথরুম।

যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা সকালবেলার কথা, এই নটা-দশটা হবে। গান্ধীজির ঘরের পাশের ঘরে একটা চৌকিতে মুখোমুখি বসে সুভাষচন্দ্র আর জহরলাল গভীর আলোচনায় মগ্ন। পণ্ডিতজি দরজার দিকে, অর্থাৎ বারান্দার দিকে মুখ করে বসে। আর সুভাষবাবু দরজার দিকে পিঠ দিয়ে পণ্ডিতজির মুখোমুখি বসে।

গান্ধীজি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা দিয়ে হেঁটে পাশের ঘরের অর্থাৎ যে ঘরে দুই নেতা বসে কথা বলছিলেন, সেই ঘরের দরজার সামনে দিয়ে সোজা চলে গেলেন বাথরুমে। একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন ওঁরা দুজনে কথা বলছেন, কিন্তু নিজে তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য থামলেন না।

কিন্তু ফিরবার সময় গান্ধীজি দরজার সামনে এসে থামলেন। গান্ধীজিকে দরজার মুখে

দাঁড়াতে দেখে পণ্ডিতজি কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। আর পণ্ডিতজি দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে সুভাষবাবু দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন গান্ধীজি সেখানে দাঁড়িয়ে।

তাদের উদ্দেশ্য করে গান্ধীজি বললেন, ''you, my old enemies, follow me everywhere!'' অর্থাৎ— তোমরা, আমার পুরনো শত্রুরা, আমি যেখানেই যাই, সেখানেই পিছু নাও; বলে হাসলেন, তার সেই অনুকরণীয় ফোকলা দাঁতের হাসি। ওরা দুজনেও হাসলেন। তাদের মধ্যে একটা শিশুসুলভ সারল্য ছিল। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসার এক অনির্বচনীয় প্রকাশ ছিল তাঁদের হাসিতে।

এই ঘটনা আমার স্মৃতিতে চিরসবুজ হয়ে থাকবে। তীব্র রাজনৈতিক বির্তকের ফলে সৃষ্ট উত্তাপ ও তিক্ততার মধ্যেও যা শেষপর্যন্ত বিচ্ছেদে পরিণত হল— উভয়ের ব্যক্তিগত সম্বন্ধে তিক্ততার লেশমাত্র ছিল না। কোনকিছুই তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরস্পরের গুণের স্বীকৃতিকে কণামাত্র ক্ষুন্ন করতে পারেনি।''[৪৫]

সোদপুরে গান্ধীজির আগমন এবারে ১৯৪৫-এ। দীর্ঘস্থায়ী এই সফরে গান্ধীজি এখানেই নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৫-এর ১ ডিসেম্বর তিনি সোদপুরে এসে উপস্থিত হন। ঐ দিনই পৌঁছবার কয়েকঘন্টার মধ্যে বাংলার গভর্নর লর্ড কেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিস্তৃত আলাপচারিতার শেষে কেসি বলেন ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীন করা হবে, গান্ধীজি প্রশ্ন করেন, আগামীদিনে দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের কেন মুক্ত করা হচ্ছে না, উত্তরে গভর্নর বলেন যে, তাদের মুক্তির ব্যপারে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন।[৪৬]

বিকালে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি বললেন, তাঁর এবারের সফর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করার জন্য। তিনি নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নিতে আসেননি। অনাহারক্লিষ্ট বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারের জন্য তিনি এখানে এসেছেন। তিনি আরও বলেন এবারে তিনি বাংলা হরফ শিখে বাংলা লেখা পড়া ও লেখার কাজ করতে চান।[৪৭]

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গভর্নর কেসির সঙ্গে তার আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। ১০ ডিসেম্বর লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গেও তিনি দেখা করেন। ওয়াভেলকে গান্ধীজি পরিষ্কার জানিয়ে দেন ভারতের সমস্যা সমাধান করতে গেলে প্রথমে ব্রিটিশদের এটা মেনে নিতে হবে যে ভারতের শাসন করার কোন নৈতিক অধিকার তাদের নেই। তারা বাঁদরের বিচার অর্থাৎ কিছু দেখি না, কিছু শুনি না, কিছু বলি না জাতীয় কাজ থেকে বিরত থেকে অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে যাক।[৪৮]

ইতিমধ্যে ৭ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক খাদি প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, কংগ্রেস ১৯২০ সালের অহিংস নীতি থেকে সরছে না। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস গঠনমূলক কাজের জন্য চরখা ও খাদির প্রসারে বিশেষ জোর দেবে। এছাড়া গঠনমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষ আগ্রহী হবে; তৃতীয়ত, বর্তমানে যে কোনো ধরনের আইন অমান্য কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। চতুর্থত, আই এন এ সেনানীদের বিচারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সর্বতোভাবে পাশে দাঁড়ালেও এটা ধরে নেওয়া হবে না যে কংগ্রেস অহিংসার পথ পরিত্যাগ করেছে। এ কাজে কংগ্রেস-এর অংশগ্রহণের কারণ

এই সব সেনানীদের সাহস, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা এবং একতা সকলের কাছেই বিশেষ শ্রদ্ধার। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে সমস্ত কমিউনিস্ট নেতাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিল ওয়ার্কিং কমিটি।[৪৯]

১৮ ডিসেম্বর গান্ধীজি শান্তিনিকেতন যান। ২০ ডিসেম্বর ফিরে এলেন কলকাতায়। আবার গভর্নর কেসির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হল। কর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন বন্দীমুক্তির বিষয়ে তিনি আলোচনা চালাচ্ছেন। তবে এক মহিলা কর্মীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন গোটা দেশই তো ব্রিটিশের শাসনে বন্দী। সে অবস্থার মুক্তি না হলে তো কোন বন্দীরই মুক্তির যৌক্তিকতা থাকে না।[৫০]

২৪ ডিসেম্বর তিনি গেলেন মহিষাদলে। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি কাঁথিতে রইলেন। ২ জানুয়ারি কাঁথিতে এক বিরাট সভায় তিনি ৫০০ কংগ্রেস কর্মীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন, সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন না যে সুভাষচন্দ্র মৃত। তাঁর ধারণা সঠিক সময়ে সুভাষচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করবেন, তিনি তাঁর সাহস ও দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা করেন, তবে তাঁর পথের সঙ্গে গান্ধীজির পথের পার্থক্য আছে। তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারেন না যে প্রকৃত স্বাধীনতা যে স্বাধীনতা রাস্তার ভিখারিকেও স্বাধীন করতে পারে তা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসবে।[৫১]

কার্ল মার্ক্স-এর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ক্যাপিটাল পড়ার সুযোগ তাঁর হয়েছে। মার্কসের পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রম দেখে তিনি মোহিত। তবে তিনি তাঁর অন্তিম সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত নন। তিনি হিংসার কোনো প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন মার্কসের চিন্তাধারা বর্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যর কোন অংশই ক্ষুণ্ণ হয় না।"[৫২]

৩ জানুয়ারি সোদপুরে আসেন। ৫ জানুয়ারি ও ৬ জানুয়ারি আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে গান্ধীজি ১৯৪১-এ গৃহীত গঠনমূলক কর্মসূচির সংশোধিত রূপ পেশ করেন। তিনি বলেন, "ব্যক্তিগত আইন অমান্য অথবা সমষ্টিগত আইন অমান্য উভয়ই রচনাত্মক প্রচেষ্টার সহায়ক এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পরিপূরক। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন সেইরূপ আইন অমান্যর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, পার্থক্য কেবলমাত্র শিক্ষার পদ্ধতির মধ্যে। উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সময় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। সশস্ত্র যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সমাপ্তি সম্ভবত আনবিক বোমায় আবিষ্কারর মধ্যে। কিন্তু আইন অমান্য শিক্ষা করার অর্থ রচনাত্মক, তাই গঠনমূলক কর্মপন্থা অনুসরণ করা।"[৫৩]

এই গঠনমূলক কর্মপন্থার ১৮টি ধারা। এগুলি হল— (১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য, (২) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, (৩) মাদক দ্রব্য বর্জন, (৪) খাদি প্রচার, (৫) অন্যান্য কুটিরশিল্পের উন্নতি, (৬) গ্রাম উন্নয়ন, (৭) বুনিয়াদি শিক্ষার প্রচলন, (৮) প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান, (৯) নারীজাতির উন্নতি (১০) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রচলন, (১১) প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উন্নতি ও প্রচার, (১২) জাতীয় ভাষা, (১৩) অর্থনৈতিক সাম্য, (১৪) কিষাণ, (১৫) মজদুর, (১৬) আদিবাসী, (১৭) কুষ্ঠরোগ, (১৮) ছাত্রসমাজের উন্নয়ন।[৫৪]

ঐ সভায় শরৎচন্দ্র বসুর সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, অহিংসার জন্য সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শরৎবাবুর বক্তব্য কি তা তিনি সংবাদপত্রে পড়েছেন। তবে সংবাদপত্রে অনেক কিছুই বিকৃতভাবে প্রকাশিত

হয়। তবুও তিনি বলেন, "সামরিক শিক্ষা বলিতে যদি কেবল শৃঙ্খলানুবর্তিতা বোঝায় তবে ঐ বিবৃতি সত্য, কিন্তু সামরিক শিক্ষার অর্থ যদি অস্ত্র ব্যবহার ও হত্যা করার কৌশলশিক্ষা হয় তবে গান্ধীজির অহিংসার আদর্শে উহার কোনো স্থান নাই। গান্ধীজি নিজেই তাঁহার প্রার্থনা সভাগুলিতে অহিংসা ও শৃঙ্খলানুবর্তিতার আবশ্যকতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন এবং যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানেই তিনি এই কথা প্রচার করিয়াছেন। শাস্তির ভয় দেখাইয়া সামরিক শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু অহিংসার শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত। এই শৃঙ্খলার ফলে হত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার শক্তি জন্মে। এই কারণেই সামরিক শৃঙ্খলা অপেক্ষা এই শৃঙ্খলাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। যদি তাহার ধারণা শরৎবাবুর মতের বিরোধী হয় এবং এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে কোনটি অনুসরণ করিতে হইবে তা সম্পর্কে বাংলার জনসাধারণ তাহাকে প্রশ্ন করে তবে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার মত ত্যাগ করিয়া শরৎবাবুকে অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিবেন। কারণ শরৎবাবু বাংলার নেতা, তিনি নন।"[৫৫]

ঐ সময়ে জনৈক ব্রিটিশ সাংবাদিক সোদপুরে গিয়ে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। বাঙালি যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তিনি মন্তব্য করেন, "লর্ড কার্জন বাঙালি যুবকদের নমনীয়তার উপর আঘাত হেনেছিলেন। স্বভাবতই তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে, তারা গরিব হলেও নপুংসক নয়। তারা মৃত্যু, দারিদ্র্য এবং জনমতকে অবজ্ঞা করেও এই পথে তাই অবিচল থেকেছে।"[৫৬]

১৮ জানুয়ারি গান্ধীজি সোদপুর আশ্রম থেকে পানিহাটি গ্রামে মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত দণ্ডমহোৎসব ঘাটে যান। "সেদিন সোদপুর হইতে পানিহাটির বটতলা যাইবার পথের দুই ধারের বাড়িগুলি পুষ্প-পতাকার দ্বারা সাজানো হইয়াছিল। আমি নির্দিষ্ট দিনে সকাল সাতটার পূর্বে একখানি বড় মোটরগাড়ি লইয়া সোদপুরে গমন করি। মহাত্মা গান্ধীকে খবর দিতেই তিনিও বাইরে আসেন। কিন্তু মোটরগাড়িতে উঠিবার কথা বলিলে তিনি বলেন, 'তুমি তো বলিয়াছ সোদপুর হইতে পানিহাটির দূরত্ব এক মাইল। আমি তীর্থস্থানে যাইব পায়ে হাঁটিয়া। যাইবার শক্তি আমার আছে। কাজেই আমি গাড়িতে যাইব না।" তখন মাঘ মাসের প্রথম দিক। সেবার শীতও বেশ পড়িয়াছিল। তথাপি গান্ধীজি সকলের সহিত পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে বটতলায় গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে এক ঘণ্টা থাকিয়া পদব্রজে সোদপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তীর্থস্থানকে তিনি কত শ্রদ্ধা করিতেন তাহা তাহার জীবনের এ ঘটনা হইতে ভাল বোঝা যায়।"[৫৭] 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে সেই দিনের বর্ণনা আজও প্রাঞ্জল।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতে সেই দিনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। "গত ১৮ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় মহাত্মাজি সঙ্গীগণের সহিত পদব্রজে পানিহাটি বটতলায় আগমন করেন। রায়বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত অমূল্যধন রায়ভট্ট, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বটতলায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি বটবৃক্ষ পরিক্রমা করিবার পর ২০ মিনিট দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রদর্শনীর জিনিষগুলি দর্শন করেন ও সে সম্বন্ধে সকল তথ্য শ্রবণ করেন। সেদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে পানিহাটিবাসী ছাত্রগণ গান্ধীজির গমনাগমনের সমস্ত পথটি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল।"[৫৮]

এর পরের দিন তিনি এখান থেকে মাদ্রাজের দিকে রওনা দেন। এ প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, "অদ্য সোদপুর আশ্রমে প্রার্থনাসভায় মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯ জানুয়ারি তিনি সোদপুর হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করিবেন এবং ২১ জানুয়ারি সকালে মাদ্রাজ পৌঁছিবেন।"[৫৯]

গান্ধীজির পরবর্তী সোদপুর সফর অসহ্য বেদনারই। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার বাতাবরণের মধ্যে ২৯ অক্টোবর গান্ধীজি দিল্লি থেকে সোদপুরে আসেন। উদ্দেশ্য দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি যাত্রা। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, "আজ বৈকালে গান্ধীজি দিল্লি মেলে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দিল্লি মেল একটু দেরি করিয়া পৌঁছে। সওয়া পাঁচটার সময় গান্ধীজি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হন। গান্ধীজি লিলুয়ায় অবতরণ করেন। ক্ষিতিশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখ ইহাকে সংবর্ধনা জানান। একটি বিরাট জনতা জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া গান্ধীজিকে সংবর্ধনা জানান। হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের সুপার স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সোদপুরে প্রার্থনার পর গান্ধীজি বলেন যে তিনি দুই-একদিন কলিকাতায় থাকিয়া নোয়াখালি যাত্রা করিবেন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ আজ গান্ধীজির সহিত দেখা করেন।"[৬০]

৩১ অক্টোবর গান্ধীজির সঙ্গে বাংলার প্রিমিয়ার সুরাবর্দী ও গভর্নর মিঃ কেসি সোদপুরে আসেন। তাঁরা দুই ঘণ্টা বৈঠক করেন। সুরাবর্দী বিকালে আবার আসেন ও রাত নটা পর্যন্ত বৈঠক করেন। বিরক্ত ক্ষুব্ধ গান্ধীজির সরকারের অপদার্থতার প্রতি তীব্র সমালোচনা প্রতিটি প্রার্থনাসভাতেই সরকারের আছে চরম বিড়ম্বনার কারণ হচ্ছিল। সরকারি হস্তক্ষেপে বারবার গান্ধীজির নোয়াখালি যাত্রা বিলম্বিত হচ্ছিল। "ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইবে না অখণ্ড থাকিবে তাহার বিচার শক্তির দ্বারা হইতে পারে না। একমাত্র পরস্পরের বোঝাপড়ার ভিতর দিয়াই ইহার বিচার সম্ভব। বিভক্ত হউক আর সংযুক্তই থাকুক সরকারের বোঝাপড়া এবং শুভেচ্ছার ভিত্তিতেই তাহা করিতে হইবে।"[৬১]

বিহারের দাঙ্গার বার্তাতে উদ্বিগ্ন গান্ধীজি একদিন বিরক্তির সঙ্গে মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস সমস্ত লোকের ও লীগ মুসলিম ভাইবোনদের। যেখানে কংগ্রেসের রাজত্ব সেখানে কংগ্রেস যদি মুসলিমদের রক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী থাকার প্রয়োজন কি? লীগশাসিত প্রদেশে হিন্দুরা রক্ষা না পাইলে লীগ প্রধানমন্ত্রীর অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন নাই। ইহাদের দুই জনকেই যদি মিলিটারির সাহায্য লইতে হয় তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে সঙ্কটকালে জনসাধারণের উপর ইহাদের কোনো প্রভাব নাই। ইহার অর্থ এই যে, আমরা দুই পক্ষ ব্রিটেনকে ভারতে থাকিয়া যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এই কথাটি সকলের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।"[৬২]

সরকারি নানা টানাপোড়েনের পর ৬ নভেম্বর গান্ধীজি নোয়াখালির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দাঙ্গাবিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গে গান্ধীজির সেই সফর এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘ পাঁচ মাস পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কাটিয়ে ৩ মার্চ তিনি সোদপুরে ফিরে আসেন। ৪ মার্চ সুরাবর্দী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৫ মার্চ তিনি বিহারের দিকে যাত্রা করেন।

কয়েকমাস পরেই গান্ধীজি আবার সোদপুরে আসেন। গান্ধীজি তাহার নাতনি মনু গান্ধী, ওয়ার্ধা আশ্রমের বিষেণজি ও ডা. অমিয় চক্রবর্তী সহ সঙ্গীরা সকালে হাওড়া স্টেশনে নেমে সোদপুরে আসেন। গান্ধীজি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "তিনি একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

লইয়া বাংলায় আসিয়াছেন। কাজেই অন্য কোনো ব্যাপারে তিনি জড়াইতে চাহেন না।"[৬৩]

গান্ধীজির সেই বিশেষ বিষয়টি ছিল যুক্তবঙ্গ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা। ৯ মে শরৎচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ১০ মে আবুল হাশেম মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় শরৎচন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। ১১ মে সুরাবর্দী রাজস্বমন্ত্রী ফজলুর রহমানকে নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ বিভাগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পুনরায় ১২ মে সুরাবর্দী সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এক ঘণ্টা আলোচনা করেন। এই আলোচনার সময় মহম্মদ আলি ও আবুল হাসেম উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে সুরাবর্দী, ফজলুর রহমান ও মুসলীম লীগের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসু বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র নিয়ে ঘন ঘন আলোচনা হয়। ১১ মে সুরাবর্দীর বাড়িতে শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, ফজলুর রহমান ও আবুল হাশেমও উপস্থিত ছিলেন। ১২ মে সুরাবর্দী আবার সোদপুরে আসেন। ১৩ মে আসেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু আলোচনার কোনো সদর্থক পরিণতি না লক্ষ্য করে ১৫ মে গান্ধীজি বিহারের দিকে রওনা দেন।[৬৪]

১২ মে শরৎচন্দ্র বসু বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা পেশ করেন তাতে বলা হয় ভবিষ্যতে বাংলা একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বাংলার সংসদ সদস্যদের নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত সদস্যরা ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। বর্তমান মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হবে ও অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা বাংলার দায়িত্ব নেবে। বাংলার সরকারি চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানদের সমান সংখ্যক পদ নির্দিষ্ট থাকবে। ৩০ বা ৩১ জন সদস্যকে নিয়ে বাংলার সংবিধানসভা গঠিত হবে। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় ৮ জন মন্ত্রী থাকবেন। এর মধ্যে ৪ জন হবেন হিন্দু ও ৪ জন মুসলমান। প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলিম ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হবেন হিন্দু। এই মন্ত্রিসভা কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। ব্রিটিশ সরকার এই নতুন মন্ত্রিসভার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।[৬৫]

এই পরিকল্পনা রচিত হওয়ার সংবাদে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ একে স্বাগত জানালেও কোনো কোনো মহল এই প্রস্তাবের পুরো বিরোধিতা করেন। এরই মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সোদপুরে এসে উপস্থিত হন। শ্যামাপ্রসাদ শুনেছিলেন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব গান্ধীজির সমর্থন লাভ করেছে। তাই তিনি সরাসরি এসে গান্ধীজিকে বলেন যে, যদিও সুরাবর্দী-এর প্রকৃত রচয়িতা কিন্তু এর পিছনে রয়েছে বাংলার পাট ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক স্বার্থ। এছাড়াও লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অনুরোধ করেছেন। গান্ধীজি সহাস্যে মন্তব্য করেন, "তবে আপনার আপত্তি প্রস্তাবের লেখক কে তা নিয়ে? প্রস্তাবের গুণ, দোষ নিয়ে আপনার বক্তব্য কি?" সেসময় শ্যামাপ্রসাদ বলেন যে যদিও বর্তমানে সুরাবর্দী স্বাধীন বাংলার কথা বলছেন পরে তিনি এটিকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে বলবেন। উত্তরে গান্ধীজি বলেন, পারস্পরিক সহমত ছাড়া নতুন রাষ্ট্র কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। তিনি তখনও বলেন, যে মন্ত্রিসভার হিন্দু নেতাদের যদি সুরাবর্দী প্রভাবিত করেন তখন কি হবে? উত্তরে গান্ধীজি বলেন— সেসময় একান্ত বাধ্য হবে বাংলাকে ভাগ করা যেতে পারে। শেষপর্যন্ত তিনি বলেন যে সুরাবর্দীর প্রস্তাবকে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। তিনি এবিষয়ে শ্যামাপ্রসাদকে সনির্বন্ধ

অনুরোধ জানান।[৬৬]

অন্যদিকে মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত হয় সুরাবর্দী যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার সময় এটা স্পষ্ট করে দেবেন যে এটি কোনদিনই ভারতের অঙ্গ হবে না।[৬৭]

গান্ধীজি পাটনা থেকে শরৎচন্দ্র বসুকে এক পত্রে লিখলেন যে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্রে যেন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হয়। সব সিদ্ধান্তর পিছনেই উভয় সম্প্রদায়ের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকে।[৬৮]

নানা জটিলতার জন্যই যুক্তবঙ্গের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। যদিও সোদপুরে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজি বলেছিলেন, বাংলা-পাঞ্জাব নয়, এরা বীরের মতো কার্জনের সঙ্গে লড়াই করেছে। তিনি বলেন, ''সুরাবর্দী সাহেব যদি এই মনোভাব নেন তবে তিনি (গান্ধীজি) একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হিন্দুদের বোঝাইবেন এবং তিনি এইটুকু জোর করিয়া বলিতে পারেন যে, একজন হিন্দুও বাংলার ঐক্যের, যে ঐক্যের জন্য বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বীরের মতো লড়িয়াছে এবং লর্ড কার্জনের মতো শক্তিশালী বড়লাটের স্থির সিদ্ধান্তকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে তাহার বিরোধিতা করিবে না।''[৬৯]

যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব সেসময় বাংলার সংবাদপত্রে কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল তার একটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা'তে ১০ মে গান্ধীজির একটি ছবি প্রথম পাতায় ছাপা হয়। নীচে বড়ো হরফে আবেদন করা হয়, ''কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় যাহারা ভারত বিভাগ এবং প্রদেশ বিভাগ চান না, স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ বাংলার স্বেচ্ছামূলক যোগদান সমর্থন করেন, বাংলা হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ ও জমিদারি প্রথা এখনই উচ্ছেদ করিতে চাহেন, তাহারা তারযোগে গান্ধীজি এবং জিন্না সাহেবের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করুন ও স্বাধীনতায় তাহার নকল পাঠান।[৭০]

অবশেষে ১৯৪৭-এর ২০ জুন শুক্রবার বাংলার আইনসভার সদস্যরা বাংলাদেশকে দুটো অংশে বিভক্ত করবার পক্ষে ভোট দেন। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের আবির্ভাব হয়। শরৎচন্দ্র বসু ২৭ জুন গান্ধীজিকে এক পত্রে লিখলেন, ''আমার কাছে এটা বেদনার যে কংগ্রেস এখন জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে হিন্দুদের সংগঠনে পরিণত হয়েছে।''[৭১]

সোদপুরে গান্ধীজির শেষ আগমন ১৯৪৭-এর ৯ অগস্ট। উদ্দেশ্য তিনি পূর্ববঙ্গে যাবেন। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বিকালে এলেন গভর্নর ফ্রেডরিক বারোজ, মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ওসমান। লীগ নেতারা কলকাতায় তাদের অবস্থার কথা বর্ণনা করে বারবার দাবি করতে লাগলেন তাঁদের বাঁচাবার জন্য গান্ধীজির কলকাতায় থাকা জরুরি। ১০ অগস্ট মহম্মদ ওসমান আবার এলেন, সঙ্গে এলেন একদল লীগ নেতা। এদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে গান্ধীজি বললেন, ''আমি থেকে যেতে পারি কিন্তু কথা দিতে হবে নোয়াখালিতে হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।'' লীগ নেতারা কিছুটা দ্বিধার সঙ্গেই এই বিষয়ে কথা দিলেন। দাঙ্গার নায়ক মিঞা গোলাম সারওয়ার তার সহকারী কাশিম আলীকে পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপনের আর্জি জানিয়ে তার পাঠালেন।

১১ অগস্ট গভর্নরকে গান্ধীজি লিখে পাঠালেন আপনার অনুরোধে যে কাজ হয়নি একদল লীগ কর্মীর অনুরোধে সে কাজ হয়েছে। আমি ১৩ অগস্ট পর্যন্ত সোদপুরে আছি। প্রার্থনাসভায় এই বিবৃতি পাঠের পর তিনি মন্তব্য করলেন, ''পুলিশের মধ্যে যদি

সাম্প্রদায়িকতা কাজ করে তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"[৭২]

এমন সময় উপস্থিত হলেন সুরাবর্দী। তিনি করাচীতে থাকাকালীন গান্ধীজির কলকাতায় বাসের খবর পান। ১১ অগস্ট তিনি সোদপুরে এলেন, এসেই মধ্যরাত পর্যন্ত বৈঠক করলেন। বললেন, জলন্ত কলকাতাকে রেখে নোয়াখালি যাত্রার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হবে। শর্ত রাখলেন গান্ধীজি। তিনি বললেন, শান্তি স্থাপনে তিনি পথে নামবেন, তবে তার জন্য সুরাবর্দীকে গান্ধীজির সঙ্গে থাকতে হবে। একই বাড়িতে একই ঘরে সে এলাকা যতই উপদ্রুত হোক না কেন প্রহরী ছাড়া সেখানেই দু'জনে থাকবেন। যদি এ প্রস্তাব সুরাবর্দী মেনে নেন তবে তিনি নোয়াখালি যাবেন না। সময় দিলেন গান্ধীজি। রাতে চিন্তা করে পরের দিন সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। পরের দিন অর্থাৎ ১২ তারিখ মহম্মদ ওসমান সুরাবর্দীর সম্মতিপত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন, বিকালে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজি জানালেন— তিনি কলকাতাতে শান্তি স্থাপনের সময় দেবেন। তিনি এবং সুরাবর্দী এক ছাদের তলাতে বাস করবেন। তিনি জনগণকে অনুরোধ করলেন তাঁর এই উদ্যোগকে সকলে যেন শুভকামনা জানায়।

১৩ অগস্ট সকালে গান্ধীজি প্রায় এক ডজন চিঠি লিখলেন। দেড়টা পর্যন্ত চিঠি লিখে বেলেঘাটা যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ঠিক আড়াইটার সময় সুরাবর্দীর দেরি দেখে তিনি গাড়িতে উঠলেন। যাত্রা করলেন বেলেঘাটার দিকে। এই তাঁর শেষ যাওয়া।

সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক গুরুত্ব ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারিতে শেষ হয়ে গেল। ইতিহাসের সাক্ষী এই ভবন বহু স্মৃতিকে বুকে আঁকড়ে নিয়ে পড়ে রইল। ১৯৬৪তে প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ জমি সরকারি আবাসন হল। বর্তমানে সেই মূল ভবনের পাশে পুরনো একটি ভবন ছাড়া অতীতের কোনো চিহ্ন নেই। এখন প্রশ্ন দীর্ঘকাল অবহেলায়, অযত্নে এই প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহাসিক ভবনটি জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছিল। অবশেষে পানিহাটি পৌরসভা এই ঐতিহাসিক ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেয়। স্থাপিত হয় গান্ধীজির একটি আবক্ষ মূর্তি। পৌরপ্রধান মনোরঞ্জন সরকারের উপস্থিতিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। বর্তমানে গান্ধীজির পৌত্র পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীগোপালকৃষ্ণ গান্ধীর উদ্যোগে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত এই প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণাঙ্গ মেরামতির কাজ চলছে। স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্ধকার দূরে সরিয়ে ইতিহাস একবার, আর একবার নিজেকে স্বমহিমায় প্রকাশ করবে না? বলবে না, এ স্থান, এ মাটি বড়ো পবিত্র। একে রক্ষা করার দায় তোমাদের— তোমাদের সকলের।

নির্দেশিকা :

১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস— রমাকান্ত চক্রবর্তী; চৈতন্যদেব-ইতিহাস ও অবদান— অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা; ২০০০, পৃঃ ২০৪

২। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত— শ্রীম কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা; ১৯৯৬, পৃঃ ২৬৩

৩। In Memorium— শ্রদ্ধাঞ্জলি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিধুভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট; ১৯৮৯, পৃঃ ২৫

৪। Mahatma— Life of Mohondas Karamchand Gandhi— D G Tendulkar. Volume Two (1920-1929), The Publication Division, 1990 pg. 185. "Bengal has a very good and very cheap wheel. Khadi Pratisthan has

an excellent wheel that works well and sells at two rupees and eight annas. I have not known a cheaper machine in all India of the same type. I wish that Bengal will adopt the Pratisthan model.''

৫। In Memorium— শ্রদ্ধাঞ্জলি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত; পৃঃ ১১০, ''He has shown, through the power of dedicated endeavour and scientific action, that we can eliminate the word impossible from the dictionary.''— Dr. M. S. Swaminathan.

৬। Dictionery of National Biography— Ed by S. P. Sen, page 371 ও In Memorium, page

৭। The Gandhians of Bengal— Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientation 1920-1942, Mario Prayer. Roma Istituti Editorial's E Poligrafic, Internazionali, 2001, pg. 168.
''It was 1921. I was running on with the stupendous expansion of the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd. about which I had promised to myself that we shall make it the biggest chemical works in the East including those of Japan which had marched forward in the chemical Industries line.''

৮। স্মৃতিকথা— সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ে; ১৯৪৬ সালের ১২ এপ্রিল গৃহীত সাক্ষাৎকার।

৯। ঐ

১০। Mario Prayer— Pg 172, ''The chemical works became into intolerable for me.''

১১। তদেব, পৃঃ ১৬৪

১২। স্মৃতিকথা— সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

১৩। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থের সূচি

১৪। In Memorium ও Maria Prayer— pg 169, ''Satis temporarily agreed with both his masters (P C Ray and Gandhi) but at the same time opened as khadi centre in the Maniktola Plant, enrolled around 400 workers in it and asked them to make a vow that they would only wear clothes which they had spun themselves.''

১৫। Ibid, pg 171-172

১৬। Ibid, pg 173

১৭। Tendulkar, Volume two page 170

১৮। Mahtma Gandhi Complete Works (MGCW) vol 25 Publication Division, 1994. ''Page 527-28''. The lantern lecture tracing the tragic history of the ruin of the greatest national industry and the possibilities of its revival were Opposite, instructive and amusing. I tender my congratulations to Satis Babu upon the thoughtful and through manner in which he organised these lectures.''

১৯। Ibid, pg 547
২০। Ibid, pg 549
২১। MGCW, vol 27, Publication Division, 1990 pg 146-147
২২। Tendulkar, Volume Two, page 143
২৩। MGCW, Vol 32— "You will see that he (Satis) has staked his all on khadi. Many of you will think that he has gone mad, but I tell you it is faith that moves mountains and Satisbabu has faith in Khadi and the determination that he must stop, as much as he can, the lakhs of rupees worth of foreign cloth that is dumped every day in the Calcutta market."
২৪। প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩, পৃঃ ৬০৪-৬০৬
২৫। Tendulkar, Volume Two, page 243
২৬। Ibid, pg 243
২৭। সতীশ দাশগুপ্তের গান্ধীজির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র MGCW, Vol 41, pg 573
২৮। Ibid, Vol 40, pg 17-20
২৯। Ibid, Vol 40
৩০। Tendulkar, Volume Two. pg 347
৩১। Ibid, pg 348-349
৩২। Ibid, pg 357
৩৩। Ibid, pg 357
৩৪। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা— অমলেশ ত্রিপাঠী, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৫৯
৩৫। তদেব, পৃঃ ২৬৯
৩৬। গান্ধী-সুভাষ সংঘাত— বিজয়কুমার নাগ সংকলিত, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃঃ ৫০
৩৭। তদেব, পৃঃ ৫৯
৩৮। তদেব, পৃঃ ৫৯-৬০
৩৯। তদেব, পৃঃ ৬৩-৬৪
৪০। তদেব, পৃঃ ৬৪
৪১। তদেব, পৃঃ ৬৭
৪২। পানিহাটি পরিক্রমা— কৃশানু ভট্টাচার্য, ২০০০, পৃঃ ৩৬-৩৭
৪৩। Tendular, Volume Five, pg 86
৪৪। Ibid, pg 87
৪৫। গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত— বরুণ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা।
৪৬। Tendulkar, Volume Seven, pg 21
৪৭। Ibid, pg 21
৪৮। Ibid, pg 22
৪৯। Ibid, pg 23
৫০। Ibid, pg 28
৫১। Ibid, pg 32

৫২। Ibid, pg 33
৫৩। "শনিবার বঙ্গীয় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে গান্ধীজি কর্তৃক গঠনমূলক কর্মপন্থা বিশ্লেষণ।" যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি, ১৯৪৬, পৃঃ ১
৫৪। যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ১৯৪৬, পৃঃ ১
৫৫। সামরিক শিক্ষা ও অহিংসা— যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ১৯৪৬, পৃঃ ১
৫৬। Tendular, Volume Seven, pg 38
৫৭। গান্ধী নীতি— ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমাজশিক্ষা পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ২৭৬-২৭৭
৫৮। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃঃ ২৬২-৬৩
৫৯। স্বাধীনতা, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৬, পৃঃ ১
৬০। স্বাধীনতা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৬, পৃঃ ১
৬১। স্বাধীনতা, ১ নভেম্বর ১৯৪৬, পৃঃ ১; গান্ধীজি কর্তৃক দাঙ্গার নিন্দা।
৬২। বিহারের জন্য গান্ধীজির উদ্বেগ, স্বাধীনতা, ৫ নভেম্বর ১৯৪৬, পৃঃ ১
৬৩। স্বাধীনতা, ১০ মে ১৯৪৭, পৃঃ ১
৬৪। স্বাধীনতা বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি— অমলেন্দু দে, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৪
৬৫। Partition— Sunil Kumar Das, Sarat Bose Commomoration Volume, pg 80
৬৬। My Days with Gandhi-Nirmal Kr. Bose, pg 233-34
৬৭। Partition, pg 81
৬৮। Ibid, pg 81
৬৯। স্বাধীনতা, ১১ মে ১৯৪৭, পৃঃ ১
৭০। স্বাধীনতা, ১০ মে ১৯৪৭, পৃঃ ১
৭১। স্বাধীন বঙ্গভূমি, পৃঃ ৯৬, "It rives me to find that the Congress which was once a great national organisation is fast becoming an organisation of Hindus only."
৭২। Mahatma Gandhi : The last Phase, Volume Two, page 363

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর
২। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন জেলা গ্রন্থাগার
৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৪। সুবোধ বসু ও যুগান্তরের কর্মীবৃন্দ
৫। মুজফফর আহমদ পাঠাগার, গণশক্তি
৬। পানিহাটি টাউন লাইব্রেরী
৭। বিধুভূষণ দাশগুপ্ত
৮। ডা. রাইমোহন পাল
৯। অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট লেখক। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক*

মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮৬৯ : গুজরাটের পোরবন্দরে দোসরা অক্টোবর জন্ম।

১৮৭৬ : রাজকোটের পাঠশালায় ভর্তি।

১৮৮০ : কাথিয়াওয়াড়ের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি।

১৮৮৭ : কস্তুরবার সঙ্গে বিবাহ।

১৮৮৭ : ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৮৮ : ৪ সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত রওনা।

১৮৯১ : ১০ জুন ব্যারিস্টারি পাশ করে ১২ জুন স্বদেশ অভিমুখে রওনা।

১৮৯৩ : এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হন পোরবন্দরের জনৈক ব্যবসায়ীর একটি দেওয়ানী মামলায় বড় আইনজীবীর সহায়কের কাজ করার জন্য। মে মাসের শেষ ভাগে নাতাল উপস্থিত হন এবং আদালত, রেলগাড়ি ও পথে-ঘাটে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হন ও অপমানিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।

১৮৯৪ : আইনজীবী হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নানা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভারতীয়দের ভোটের অধিকার হরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেন। ২২ মে নাতাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৬ : ছয় মাসের জন্য ভারতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সপক্ষে জনমত তৈরি করেন ও ফেরার সময় স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আসেন।

১৮৯৯ : বুয়র যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করে আহতদের সেবা করেন।

১৯০১ : ভারতে ফিরে কলকাতা কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তারপর বোম্বাই-এ সাফল্য সহকারে ব্যারিস্টারি করতে থাকেন।

১৯০২ : দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জরুরি আহ্বান পেয়ে বছরের শেষ ভাগে সেদেশে উপস্থিত হন ও ভারতীয়দের নাগরিক অধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৯০৪ : রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" পড়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হন ও সেই আদর্শে কৃষক ও শ্রমিকদের মত জীবনযাপনের জন্য ফিনিক্স আশ্রম স্থাপনা করেন। ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার প্রকাশ।

১৯০৬ : জুল বিদ্রোহের সময় অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করে সেবা করেন এবং জনসেবামূলক কাজের সহায়ক হবে বিবেচনা করে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ।

১৯০৭ : কালা কানুনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অহিংস প্রতিরোধ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। জনসেবায় পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎসর্গের জন্য আইন ব্যবসায় ত্যাগ।

১৯০৮ : আইন অমান্যের অভিযোগে ১০ জানুয়ারি দুই মাসের কারাদণ্ড। ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী স্মাটস একটি রফা করেন। গান্ধীজিসহ সকলে মুক্ত হন। আপোসে অসন্তুষ্ট মীর আলম ও অন্যান্যের আক্রমণে ৮ ফেব্রুয়ারি মৃতপ্রায় হন। গান্ধীজি আক্রমণকারীদের শাস্তিদিতে নিষেধ করেন। স্মাটস প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ১৬ অগস্ট আবার আন্দোলন শুরু ও ১৫ অক্টোবর গান্ধীজি দুই মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

১৯০৯ : ভারতীয়দের দাবি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ইংল্যান্ডে যান। জাহাজে "হিন্দ স্বরাজ" লেখেন।

১৯১০ : টলস্টয় ফার্ম স্থাপনা।

১৯১২ : দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে গোখলের মধ্যস্থতার প্রয়াস ব্যর্থ। ইউরোপীয় পোশাক ত্যাগ করেন।

১৯১৩ : ভারতীয় নারী ও খনি শ্রমিকরা সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারাবরণ করেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ২২২১ জন ভারতীয় নরনারী ও শিশুসহ পদযাত্রা করে সত্যাগ্রহীদের ট্রান্সভালে প্রবেশ ও গান্ধীজি সহ অনেকে গ্রেপ্তার।

১৯১৪ : ভারত ও বিশ্বের অন্যত্র ভারতীয়দের সত্যাগ্রহের সপক্ষে জনমত তৈরি হওয়ায় সরকার এক কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জুন মাসে সত্যাগ্রহীদের দাবি মেনে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ শেষ হওয়ায় গান্ধীজি লন্ডন হয়ে ভারতে রওনা হন।

১৯১৫ : ৯ জানুয়ারি বোম্বাই-এ পৌঁছান। ২৫ মে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা। গোখলের পরামর্শে ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দেশ ঘুরে দেখেন ও বীরমগাঁও-এর কাস্টমস কেন্দ্রের জুলুম বন্ধ করেন।

১৯১৬ : ৪ ফেব্রুয়ারি কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বক্তৃতায় সন্ত্রাসবাদ ও দেশবাসীর একাংশের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার নিন্দা করেন। লখনউ কংগ্রেসে যোগ দেন ও বিহারের চম্পারণের কৃষকদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দূর করার জন্য আহুত হন।

১৯১৭ : ৯ এপ্রিল কলকাতা থেকে পাটনা হয়ে চম্পারণ রওনা। বিহারের সহকর্মীদের উপস্থিতিতে চম্পারণের নীল চাষিদের মধ্যে জাগৃতি আসে, স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা প্রথমে তাঁর বিরোধ করলেও এবং বহিষ্কারের আদেশ অমান্যের জন্য আদালতে অভিযুক্ত, পরে ছোট ছোট চাষিদের দাবির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার আইন করেন।

১৯১৮ : আহমেদাবাদের শ্রমিক-ধর্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ ও শ্রমিকদের মনোবল বজায় রাখা ও হিংসার অভিব্যক্তি বন্ধ করার জন্য অনশন। গুজরাটের খেড়া জেলায় অজন্মাপীড়িত কৃষকদের কর মকুবের আন্দোলন পরিচালনা।

১৯১৯ : ৩০ মার্চ দিল্লিতে ও ৬ এপ্রিল দেশের অন্যত্র উপবাস ও হরতালের মাধ্যমে রাউলাট বিলের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্বকারী বিধানের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তোলেন। সরকারের দমননীতি শুরু এবং দিল্লি, পাঞ্জাব ও আহমেদাবাদে জনসাধারণের তরফ থেকেও হিংসার অনুষ্ঠান হয়। ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও পরে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি। গান্ধীজির পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। সরকারি অত্যাচারের প্রতিবাদে গান্ধীজি সরকারি পদক ফেরত দেন। জনসাধারণকে অহিংসাচরণের জন্য প্রস্তুত না করে আইন অমান্যের জন্য নির্দেশ দেওয়া হিমালয় প্রমাণ ভুল হয়েছে বলে স্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১৪ এপ্রিল থেকে তিন দিনের জন্য অনশন করেন। অক্টোবরে "ইয়ং ইন্ডিয়া" ও "নবজীবন" পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। নভেম্বরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ কমিটির সভায় সর্বপ্রথম অসহযোগের কথা বলেন।

১৯২০ : প্রথমে গুজরাটের প্রাদেশিক সম্মেলনে পরে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে ও ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর উদ্যোগে পাঞ্জাব খিলাফতের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবলাদে অসহযোগ ও বিলাতী পণ্য বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ভারত সফরের সময় দেশের ভীষণ দারিদ্র দেখে টুপি জামা বাদ দিয়ে কেবল হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরার সিদ্ধান্ত করেন।

১৯২১ : অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনের ঢেউ দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার তিলক স্বরাজ্য ফান্ড সংগ্রহ করা ও ২০ লক্ষ চরকা প্রবর্তনের কার্যসূচি গ্রহণ।

১৯২২ : ৮ ফেব্রুয়ারি চৌরীচৌরাতে কংগ্রেস ও খিলাফল কর্মীসহ জনসাধারণ কর্তৃক হিংসানুষ্ঠানের জন্য অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার ডাক দেন। ১০ মার্চ গ্রেপ্তার ও ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

১৯২৪ : ৫ মার্চ মুক্তি পান। সেপ্টেম্বর মাসে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য ২১ দিন উপবাস করেন। ডিসেম্বরে বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৫ : গঠনকর্মের সপক্ষে জনমত তৈরির জন্য ভারত ভ্রমণ করেন ও ভাইকমে হরিজনদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সত্যাগ্রহের পথপ্রদর্শন করেন। ২৪ ডিসেম্বর চরকা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন।

১৯২৫ : ২৪ ও ২৬ অগস্ট বারাকপুর মহকুমার টিটাগড়ে আসেন।

১৯২৭ : সিংহল ভ্রমণ।

১৯২৮ : ফেব্রুয়ারিতে তাঁর পরামর্শে ও সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে বারদৌলির কৃষক-সত্যাগ্রহ। ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, এক বছরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না পেলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হবে।

১৯২৯ : তাঁরই নির্দেশে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৩০ : ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে ২৪১ মাইল দূরস্থ সমুদ্রোপকূলবর্তী দাণ্ডীতে পদব্রজে রওনা হন ৭৯ জন সহকর্মী সহ। পথে আইন অমান্যের কথা প্রচার করতে করতে দাণ্ডীতে পৌঁছে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু ও গান্ধীজিসহ প্রায় এক লক্ষ দেশবাসী গ্রেপ্তার।

১৯৩১ : জানুয়ারি মাসে মুক্তি পান ও বড়লাট আরউইনের সঙ্গে আলোচনার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে আড়াই মাস লন্ডনের ব্যর্থ গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ২৮ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন।

১৯৩২ : সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে আবার আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও ৪ জানুয়ারি গ্রেপ্তার হন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে হরিজনদের হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক করার সরকারি প্রয়াসের বিরুদ্ধে ২০ সেপ্টেম্বর আমৃত্যু অনশন শুরু করেন এবং বর্ণহিন্দু ও হরিজন প্রতিনিধিদের আলোচনার ফলে বাঁটোয়ারা প্রত্যাহৃত হওয়ায় ২৬ সেপ্টেম্বর অনশন ভঙ্গ।

১৯৩৩ : 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। জুলাই মাসে আবার গ্রেপ্তার। সাবরমতী আশ্রম ভেঙে দেন এবং নভেম্বরে হরিজনদের উন্নয়নের জন্য ভারত সফরকালে একাজের জন্য আট লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন।

১৯৩৪ : বিহারের ভূমিকম্পপীড়িতদের মধ্যে সফর ও তাঁদের সেবা। ২৫ জুন হরিজনদের সমানাধিকার দেবার দাবির বিরোধীরা পুণাতে তাঁকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি রক্ষা পান। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যপদ ত্যাগ করে গঠনকর্মকেই প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের জন্য গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও ওয়ার্ধাকে প্রধান কর্মকেন্দ্র করেন।

১৯৩৬ : সেবাগ্রাম আশ্রমের প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৭ : ওয়ার্ধায় শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে নূতন শিক্ষাপরিকল্পনার কথা বলেন।

১৯৩৮ : রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ও বড়লাটের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থতা করেন। সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রদেশে ঘুরে অহিংস খুদা-ই-খিদমৎগারদের কার্যকলাপ দেখেন।

১০ এপ্রিল বারাকপুর মহকুমার সোদপুরে আসেন।

১৯৩৯ : দেশীয় রাজ্য রাজকোটের শাসনকর্তার শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে উপবাস করেন।

১৯৪০ : ইংরেজ ভারতকে পরাধীন রেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জোর করে তার সহায়তা নেবার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা দেন। এনড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থ ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বিশ্বভারতীকে দেন।

১৯৪১ : "গঠনমূলক কার্যক্রম" পুস্তিকা লেখেন। কংগ্রেস অহিংসা নীতি অনুসারে চলতে সম্মত নয় দেখে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অব্যহতি চান এবং তাঁর

অনুরোধ রক্ষিত হয়।

১৯৪২ : যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ক্রিপসের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ইংরেজ যথাযথ ক্ষমতা ছাড়তে প্রস্তুত না থাকায় আলোচনা ব্যর্থ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের ক্রমাগত বিজয় ও ভারতের দিকে অগ্রগতি এবং ভারতীয়দের হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করেন যে, আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বাঁচতে হলে অবিলম্বে ইংরেজের ভারত ছাড়া প্রয়োজন। তাঁর প্রভাবে অঃ ভঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ৮ অগস্ট "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে তিনিও ৯ অগস্ট ভোরে বোম্বাই-এ গ্রেপ্তার হন। সমগ্র ভারতের নেতৃত্ববিহীন জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

১৯৪৩ : ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে একুশ দিনের জন্য উপবাস করেন।

১৯৪৪ : ২২ ফেব্রুয়ারি কস্তুরবার মৃত্যু হয়। ৬ মে বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করেন। গ্রামের নারী ও শিশুদের জন্য স্থাপিত কস্তুরবা ট্রাস্টের প্রথম সভাপতি হন। সেপ্টেম্বরে বোম্বাই-এ মুসলীম লীগের সঙ্গে স্বাধীনতার দাবি নিয়ে বোঝাপড়া করার জন্য জিন্নার সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনা।

১৯৪৫ : ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আচোলনার জন্য আহুত সিমলা সম্মেলনের যোগদানকারী নেতৃবর্গকে পরামর্শ দেন। বাঙলা দেশের বন্যাপীড়িত অঞ্চল ও শান্তিনিকেতন সফর করেন।

১৯৪৬ : ব্রিটিশ মন্ত্রী কমিশনের সঙ্গে আলোচনা অংশগ্রহণ ও আলোচনাকারী কংগ্রেস নেতৃবর্গকে পরামর্শ দেন। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস যোগ দিলে তার প্রতিবাদে মুসলীম লীগ ১৬ অগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ফলে একে একে কলকাতা, বিহার, নোয়াখালি, পাঞ্জাব ও দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা থামান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজি সর্বত্র প্রাণপণ প্রয়াস করেন। ২৯ অক্টোবর কলকাতা ও সেখান থেকে ৭ নভেম্বর নোয়াখালির চৌমুহনী পৌঁছান। দমদম জেলে আসেন বন্দী মুক্তি বিষয়ে আলোচনার জন্য।

১৯৪৭ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ১ মার্চ পর্যন্ত নোয়াখালি পরিক্রমা করে একই উদ্দেশ্যে বিহারে যান। ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনে কলকাতায় থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এই উদ্দেশ্যে ১ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উপবাস করেন। ৭ দাঙ্গাপীড়িত ও উদ্‌বাস্তু অধ্যুষিত দিল্লি রওনা হন ও সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজ করতে থাকেন। ১৯ অগস্ট চানক-বারাকপুর ও কাঁচড়াপাড়ায় আসেন। মার্চ, মে ও অগস্টে সোদপুর আসেন।

১৯৪৮ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ১৩ থেকে ১৮ জানুয়ারি উপবাস করেন। ২০ জানুয়ারি তাঁকে হত্যার জন্য প্রার্থনাসভায় বোমা ফেলা হয়। ৩০ জানুয়ারি "হে রাম!"

সৌজন্য : গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর

গান্ধীজি সোদপুর স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছেন— ১৯৪৬।

সোদপুরে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজি।

গান্ধীজি সোদপুরে প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে যাচ্ছেন।

সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজি।

সোদপুরে গান্ধীজি

বারাকপুর দেবীপ্রসাদ হ. ইস্কুলে গান্ধীজি ১৯৪৭
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন

দমদম জেলে গান্ধীজি রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তাদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য (১৭.১.১৯৪৬)।

পশ্চিমবঙ্গে তদানীন্তন রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী মহাত্মা
গান্ধীর চিতাভস্ম বারাকপুরের গঙ্গায় অর্পণ করছেন (১২.২.১৯৪৮)।

সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার জন্য এসেছিলেন নেতাজি।

(১-১০) সৌজন্য : গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর

সোদপুর থেকে ট্রেনে গান্ধীজি মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হচ্ছেন।
সৌজন্য: অমৃতবাজার পত্রিকা

বারাকপুর গান্ধী ঘাট।

তৃতীয় অধ্যায়

কাজী নজরুল

নজরুলের বর্ণময় জীবনে কামারহাটি পৌরাঞ্চল

অমরনাথ ভট্টাচার্য

প্রেক্ষাপট :

পরাধীন ভারতবর্ষের এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে নজরুলের জীবন শুরু। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রতিভূ লর্ড কার্জন ১৮৯৯ সালে ভারতে বড়লাট হিসাবে আসেন। তাঁর কার্যকালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ছিল সর্বাধিক বিতর্কিত। বঙ্গভঙ্গের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই। কার্জন বঙ্গভঙ্গকে 'সেট্‌লড ফ্যাক্ট' বলেছিলেন। এই অহমিকাপূর্ণ উক্তির উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, বাঙালি 'সেটলড ফ্যাক্ট'কে 'আনসেটল' করবে। বঙ্গদেশ আন্দোলনে উদ্বেল হয়ে ওঠে। নজরুলের বয়স তখন ছয়। সেই সময়ে সূচনা হয় স্বদেশী আন্দোলনকে ভিত্তি করে ভারতে প্রথম গণআন্দোলন। ১৯০৮ সালে নয় বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর থেকেই নজরুলের জীবন-জীবিকার লড়াই শুরু। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে শুরু হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। ভারতীয় বিপ্লবীরা এই সুযোগে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার পরিকল্পনা করেন। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। নজরুলের বয়স তখন আঠারো। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালাল ইংরেজ। সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হল। এই অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। দেশ গর্জে উঠল। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেই নজরুল বেড়ে উঠেছেন। অন্যদিকে এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই কামারহাটি পৌরসভার পথ চলা শুরু। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মের (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬; ২৪ মে, ১৮৯৯) প্রায় তিনমাস পরে ১৮৯৯ সালের ১ অগস্ট কামারহাটি পৌরসভা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রাক্ কথন :

কবি নজরুল ইসলামের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীল প্রতিভার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। তাঁর জীবনসংগ্রাম ও সৃষ্টির চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, প্রেমের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা, স্নেহপ্রবণ মানসিকতা, অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির প্রশ্নে দায়বদ্ধতা। এই সবকিছুই তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কবিসত্তাকে এমনভাবে আন্দোলিত করেছিল যার ফলে তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর চলমান জীবনপথে তিনি বহুবার কামারহাটি পৌরএলাকার দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ ও বেলঘরিয়া অঞ্চলে এসেছিলেন নানা কারণে, বিশেষত বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্র ধরে। তাই কামারহাটি পৌরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জনজীবনের

বেশকিছু মানুষজনের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ ও সম্পর্ক কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্র খুঁজতেই এই নিবন্ধ।

* * * * * *

> "... আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনোদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি সেই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না, আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।..." [১]

—প্রথম প্রণয়িনী নার্গিস বেগমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছেদের ষোলো বছর পর নার্গিসের একটি চিঠির উত্তরে নজরুল এই কথাগুলি লেখেন। ব্যর্থ প্রেমের আঘাত কবিমনকে ধ্বংসের তাণ্ডবের মধ্যে নিমজ্জিত না করে তা কেমনভাবে তাঁকে সৃষ্টির উৎসবে প্রাণিত করেছিল, কেমনভাবে তাঁর কবিমানসকে উদ্দীপ্ত করেছিল তা উপরোক্ত পত্রাংশের শব্দবিন্যাসের মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে।

নজরুল ও নার্গিস বেগমের বিবাহ ভেঙে যাওয়ার প্রসঙ্গে জানা যায়, নার্গিসের মামা আলী আকবর

> "... কাবিননামায় (স্ত্রীর বরাবরে সম্পাদিত স্বামীর একটি দলিল) একটি শর্ত রাখতে চাইলেন যে বিয়ের পরে নজরুল ইসলাম নার্গিস বেগমকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না, দৌলতপুর গ্রামে এসেই সে তাঁর সঙ্গে বাস করবে। এই অপমানজনক শর্ত মেনে না নিয়ে নজরুল ইস্‌লাম বিয়ের মজলিস হতে উঠে চলে গিয়েছিল। তার মানে এই যে সৈয়দা খাতুন, ওর্ফে নার্গিস বেগমের সহিত নজরুল ইসলামের "আক্‌দ" বা বিয়ে একেবারেই হয়নি।"[২]

নজরুলের বিবাহকে কেন্দ্র করে এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে কথিত আছে যে যখনই নজরুল শুনলেন তাঁকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে তখন

> "বন্দীর বন্ধন বেদনায় কাজী নীল হয়ে গেলেন। চিরদিনের মুক্ত বিহঙ্গ। ...তাঁর বন্ধু, বান্ধব, শত পরিচয়, অজস্র কামনা, —ভুলে যেতে হবে সব? সবই যাবে মরে? ক্রীতদাসের এক পঙ্কিল জীবন বহন করতে হবে জীবনভর।"[৩]

এই অসম্মানজনক যন্ত্রণাদায়ক জীবন থেকে মুক্তির জন্য নজরুল রাতের অন্ধকারে বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে পায়ে হেঁটে দৌলতপুর হয়ে কুমিল্লায় পৌঁছন। প্রথম বিবাহের ঘটনার দিন সেনগুপ্ত পরিবারের দশজন উপস্থিত ছিলেন।[ক]

সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে নজরলের পরিচয় ১৩২৭ সাল থেকে। এই সময় নজরুল

ক। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন— ১. শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, ২. শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী (শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী), ৩. তাঁদের একমাত্র পুত্র শ্রী বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, ৪. শ্রীমতী কমলিনী সেনগুপ্তা (বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত স্ত্রী), ৫. তাঁদের শিশুপুত্র প্রবীরকুমার সেনগুপ্ত ওরফে রাখাল, ৬. শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী (বীরেন সেনের বিধবা জেঠী-মা), ৭. কুমারী প্রমীলা সেনগুপ্তা (গিরিবালা দেবীর ১৩ বছরের কন্যা), ৮. কুমারী কমলা সেনগুপ্তা (শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের ১২ বছরের কন্যা), ৯. অঞ্জলি সেনগুপ্তা ওরফে ছটু (শ্রী ইন্দ্রকুমারের ৬ বছরের শিশুকন্যা), ১০. শ্রী সন্তোষ কুমার সেন (পরিবারের একটি স্নেহাস্পদ কিশোর)।— কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা—মজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

কয়েকদিন কুমিল্লার কান্দীপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে ছিলেন। নজরুলের সঙ্গে সেনগুপ্ত পরিবারের খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল 'মা' বলতেন এবং ইন্দ্রকুমারের পুত্র বীরেন্দ্রকুমারকে রাঙাদা বলে ডাকতেন। সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে ছিলেন বীরেন্দ্রকুমারের বিধবা জেঠীমা গিরিবালা দেবী এবং তাঁর কন্যা প্রমীলা (দোলন)। প্রমীলার অন্য নাম আশালতা। তাঁর বাবা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের নায়েব। বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর গিরিবালা দেবী প্রমীলাকে নিয়ে কুমিল্লায় চলে আসেন। এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কিন্তু এঁদের স্বদেশপ্রীতি এবং সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশের মধ্যে নজরুল কয়েকদিন কুমিল্লায় কাটিয়ে যান।

এই সময় ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র কুমিল্লা উদ্বেলিত। নজরুল এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটেনের যুবরাজ ভারতে আসেন। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। হরতালের দিন নজরুল হারমোনিয়াম কাঁধে নিয়ে 'জাগরণী' গানটি গাইতে গাইতে কুমিল্লা শহর পরিক্রমা করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা থেকে কুমিল্লায় ফিরে ঐতিহাসিক 'ভাঙার গান' ('কারার ঐ লৌহ কপাট/ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট') এবং 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেন। এই বছরের শেষদিকে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার যে উদ্যোগ মুজফ্ফর আহ্মেদ নিয়েছিলেন, নজরুল এই প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯১৭ সালে নজরুল যুদ্ধে যোগ দেন। অবশ্য জীবনযুদ্ধ শুরু হয় এর অনেক আগেই। কখনও লেটোর দলে গান, কবিতা, কাহিনী লিখে ও অংশগ্রহণ করে, কখনওবা রেলের গার্ড সাহেবের বাড়িতে খানসামার কাজ করে, আবার কখনও-বা রুটির দোকান ও চায়ের দোকানে কিশোর কর্মীর দায়িত্ব পালন করে জীবিকার তাড়নায় কবিকে অর্থ উপার্জন করতে হয়েছে। দশম শ্রেণির প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। এই সময়েই তাঁর সংগীত ও সাহিত্য চর্চায় হাতেখড়ি। রাশিয়ায় লালফৌজের বিজয় অভিযানের সংবাদ তিনি যুদ্ধ শিবিরেই পেয়েছিলেন। রাশিয়ার জনজীবনের এই পরিবর্তন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল। যুদ্ধের পর ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দিলে তিনি কলকাতায় মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। তখন ১৯২০ সাল। মুজফ্ফর আহ্মদের বয়স তখন একত্রিশ, নজরুলের একুশ। তাঁর প্রেরণায় নজরুল কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়েন, কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল সংগীতের বাংলা রূপান্তর করেন। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় নজরুল 'দৈনিক নবযুগ', 'লাঙল', 'ধূমকেতু', 'গণবাণীর'-র মতো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন।

নজরুলের জীবনে ১৯২২ সাল আর একটি তাৎপর্যময় বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই বছরের প্রথম দিকে নজরুল বেশ কয়েকদিন কুমিল্লায় থাকেন। এইসময় গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলার স্বদেশপ্রীতি, প্রাণময়তা, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি নজরুলকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। প্রমীলার এইসব গুণাবলী ও নজরুলের ভাবাতিশয্য উভয়ের সম্পর্ককে নিবিড়তর করে। শুরু হয় নজরুলের প্রেমজীবনের এক নতুন অধ্যায়। 'বিজয়িনী' কবিতাটি এই সময় লেখা। 'ধূমকেতু' পত্রিকাটিও এই বছরের ১১ আগস্ট প্রকাশিত হয়। ধূমকেতুর প্রকাশকে স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী সহ

(কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েসু/ আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,/ দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে/ উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!) 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নজরুলকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমনকে উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে কবি লিখেছিলেন—

'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তির আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, —আসবি কখন সর্বনাশী?'

এই কবিতার জন্য ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর নজরুল রাজদ্রোহের আপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত' নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। এইবছর জেলসুপারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে হুগলি জেলে নজরুল অনশন শুরু করেন। অনশন ভাঙার অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করেন 'Give up hunger strike, our literature claims you'—রবীন্দ্রনাথের এই টেলিগ্রাম নজরুলের হাতে শেষ অবধি পৌঁছায়নি। জেলপরিদর্শকের আশ্বাসে তিনি অনশন ভাঙতে সম্মত হন। এইদিনই কুমিল্লা থেকে বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলকে দেখতে আসেন এবং তাঁর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন। এইবছর ১৮ জুন নজরুলকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৫ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাজবন্দী হিসাবে নজরুল ১৯২৩ সালে হুগলি জেলে রচনা করেছিলেন 'এই শিকল পরা ছল' এবং বহরমপুর জেলে 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া'।

১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল কলকাতায় (৬, নম্বর হাজি লেনে) নজরুলের সঙ্গে প্রমীলা সেনগুপ্তর বিবাহ হয়। প্রমীলার মা গিরিবালা ছাড়া সেনগুপ্ত পরিবারের কেউ এই বিবাহ সমর্থন করেননি।[খ] বিবাহের পর নজরুল সস্ত্রীক হুগলিতে এলে তাঁকে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাননি। পরে ভূপতি মজুমদার নজরুলকে হামিদুল নাবি মোক্তারের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং এখানেই তিনি সংসার জীবন শুরু করেন।

নজরুলের ঘটনাবহুল জীবনের চড়াই-উতরাইয়ের সুদীর্ঘ পথ হেঁটেছেন প্রমীলা। ১৯২৬ সালে প্রমীলাকে নিয়ে কবি কৃষ্ণনগরে আসেন এবং এখানেই কবি-পুত্র বুলবুলের জন্ম। এই বছরে তিনি বহু পরিচিত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' গানটি রচনা করেন। রফিকুল

খ। "...গিরিবালা দেবীর মনের দৃঢ়তার জন্যেই নজরুল আর প্রমীলার বিয়ে হতে পেরেছিল। তিনি তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। বিরজাসুন্দরী দেবী উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন। নজরুলকে তিনি যে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন তাতে কোনও খাদ মিশানো ছিল না। উদার-প্রশস্ত মন ছিল তাঁর। তবুও তাঁর সামনে হিমালয়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের একান্ত রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার ভিতরে থেকেই তাঁকে ভবিষ্যতে তাঁর দুটি মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। তাঁর স্বামী শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত এ বিয়েতে রাজী ছিলেন না। ...এই অবস্থায় বিয়ের আগে শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী কলকাতায় এসে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন। তাঁরা যাননি।" —কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা— মজুফ্ফর আহ্‌মদ।

ইসলামের মতে, বাংলার গণসংগীতের সূচনা এই ব্যতিক্রমী গানটি দিয়েই। ১৯২৭ সালে 'গণবাণী' ও 'লাঙল' যুক্ত করে প্রথম বামপন্থী সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' প্রকাশিত হয়। 'গণবাণী'-তে এই বছর অন্তর-ন্যাশানাল সঙ্গীত ছাপা হয়। কৃষ্ণনগরে নজরুলের সঙ্গীত প্রতিভার লক্ষ্যণীয় বিকাশ ঘটে। তাঁর হাতে বাংলা গান নবযৌবন লাভ করে। শোক দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য কবির কৃষ্ণনগরের জীবন কোনও কোনও সময় দুর্বিষহ মনে হলেও প্রমীলার সহনশীল ভূমিকা সাংসারিক পরিবেশকে প্রীতিময় রেখেছিল বলেই কবির সৃজনশীল প্রতিভা রুদ্ধ হয়নি।

১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে নজরুল রেড়িও, এইচ.এম.ভি. গ্রামোফোন কোম্পানি ও কলকাতার মঞ্চে অভিনীত নাটকের জন্য গান লেখা ও সুরারোপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ১৯২৯ সালের ১০ ডিসেম্বর কবিকে যে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেখানে সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ দেন। এই বছরই নজরলের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়। ১৯৩১ সালে দার্জিলিং-এ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় ১৯৩৪ সালে— গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে 'ধ্রুব' চলচ্চিত্র পরিচালনা, গীতরচনা, সঙ্গীত পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কাব্য-সাহিত্য, সঙ্গীত, বেতার, গ্রামোফোন, নাটক ও মঞ্চ— সর্বত্র নজরুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ১৯৩৯ সালে প্রমীলার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে পড়ে। তবু শয্যাশায়ী অবস্থায় থেকেও তিনি দীর্ঘ তেইশ বছর সীমাহীন মমত্ব ও আন্তরিকতা নিয়ে নজরুলের সেবা করেছেন। মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে প্রমীলার মৃত্যুর (৩০ জুন, ১৯৬২) পর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়ায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

হৃদয়ের গহন গভীরে সুরের অনুরণন যে ক্রমশ স্তব্ধ হতে চলেছে কবি অনুভব করেছিলেন বলেই নীরব নির্বাক জীবনপর্বে পা দেবার আগেই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র উৎসব মঞ্চে দাঁড়িয়ে (এপ্রিল, ১৯৪১) বলেছিলেন—

> "যদি আর বাঁশি না বাজে, আমি কবি বলে বলছি নে, আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি, আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি। আমি নেতা হতে আসিনি। আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম— সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নিরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম"।[৪]

এই ভাষণের একবছরের মধ্যে নজরুল ধীরে ধীরে সম্বিত হারান। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর এই অ-প্রেমের পৃথিবীতেনির্বাক জীবনযাপনের পর নীরব অভিমানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন ১৯৭৬ সালের ২০ অগস্ট। একটি বর্ণময় জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি হয়।

॥ ১ ॥

দক্ষিণেশ্বরে নজরুল :

ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর এক পুত্র বীরেন্দ্রকুমার ও দুই কন্যা কমলা ও অঞ্জলি। অঞ্জলি সেনগুপ্তের সঙ্গে ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের বিবাহ হয়। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বড় ভাই বসন্তকুমার সেনগুপ্ত। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে বসন্তকুমার ও গিরিবালা

দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের বিবাহ হয়। সুতরাং বৈবাহিক সূত্রে নজরুল ও অনন্তকুমার ভায়রাভাই হন।

ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্ত প্রথমে কলকাতায় এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে ললিত মোহন দে-র বাড়িতে (২২, নম্বর কেদারনাথ ব্যানার্জি রোড, দক্ষিণেশ্বর) ভাড়া থাকতেন। এই বাড়িতে নজরুল বহুবার এসেছেন ও থেকেছেন। অনন্তকুমারের ভাইপো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সচিব ড. মানব সেনগুপ্ত খুব সুন্দরভাবে নজরুলের প্রতি তাঁর দাদুর মানসিকতার পরিবর্তনের কথাটি তুলে ধরেছেন— "ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের পিতা অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্তের (সেনশর্মা) সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় হয় দক্ষিণেশ্বরের ভাড়া বাড়িতে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ হিসাবে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। তাই নজরুলের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রেখে চলতেন। কিন্তু নজরুলের উদাত্ত কণ্ঠে ভক্তিগীতি ও দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত শুনে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে জাত-পাত ও ধর্মের সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে বলেছিলেন, নজরুল ইসলামের কোনও জাত নেই। কারণ ইসলাম ও হিন্দু উভয়ধর্মের মর্মবাণী যে এক— এই মহৎ উপলব্ধি ও বোধ তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে মিশে গেছে। এরপর অশ্বিনীকুমার রক্ষণশীল মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নজরুলকে নিয়ে একই সাথে আহারাদি করেছেন।"

ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র অঞ্জনকুমার সেনশর্মা (সেনগুপ্ত) তাঁদের পরিবারের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উল্লেখ করে বলেছেন— "সুস্থ অবস্থাতেই নজরুল অন্তত তিনবার দক্ষিণেশ্বর গ্রামে এসেছিলেন। একবার এসেছিলেন অনন্তকুমার সেনগুপ্তের পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মত শোকগ্রস্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। আমার মনে আছে সেদিন তিনি অনন্তকুমারের সদ্য বিধবা মা-কে "শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে" গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আর একবার এসেছিলেন পারলৌকিক কাজের শেষে নিয়মভঙের দিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। ...আরও একবার এসেছিলেন একটি নতুন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করতে নিমন্ত্রিত হয়ে। ...উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে ওঠার অল্প পরেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় সভা ভঙ্গ হয়ে যায়। নজরুল হাসিমুখে বৃষ্টিকে 'মূর্তিমান রসভঙ্গ' বলতে বলতে নেমে আসেন।"

"দক্ষিণেশ্বরে অনন্তকুমার সেনগুপ্ত একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বিন্ধ্যবাসিনীতলার কাছে। সার্বজনীন দুর্গোৎসবটি হত সেই বাড়ির কয়েকটি বাড়ি উত্তরে এক ছোট কারখানা মালিকের নির্মীয়মান বসত বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিতে। এই জমির প্রায় বিপরীতে ব্যানার্জি পরিবার থাকতেন, যাঁদের তিন ভাই-এর (সুশীল, অনিল, সুনীল) কনিষ্ঠজন খেলাধূলার জগতে পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বরের যে বাড়িতে নজরুল আসতেন সেই বাড়ির কাছে প্রয়াত পদ্মপলাশ সিংহের (মণ্ডল) পুত্র জিতেন্দ্রনাথ সিংহ (৭৭) থাকেন। জিতেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে— "...প্রয়াত অধ্যাপক ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় ললিত মোহন দে-র ২২, নম্বর কেদারনাথ ব্যানার্জি রোড দক্ষিণেশ্বরের তৎকালীন নবনির্মিত বাড়ির দ্বিতলে ভাড়া থাকতেন। বর্তমানে ঐ বাড়িটি খুশিমোহন কর্মকার ক্রয় করেছেন।"

"কাজী নজরুল ইসলাম ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেঠতুতো ভায়রাভাই। কবি নজরুল ড. সেনগুপ্তের দক্ষিণেশ্বরের ঐ বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আমার প্রয়াত পিতা

পদ্মপলাশ সিংহ মহাশয়ের (৩১ নম্বর কেদারনাথ ব্যানার্জি রোড, দক্ষিণেশ্বর) বাড়ির মাঠে 'প্রগতি সংঘ' ১৯৩৮ সালে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা শুরু করে। আমার পিতা 'প্রগতি সংঘ'-এর দুর্গাপূজার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ...১৯৪১ সালে দুর্গাপূজার সময় বেশ কিছুদিন নজরুল ড. সে॰ :প্তর দক্ষিণেশ্বরের ওই ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। বাড়ির সামনে প্রয়াত ইন্দুভূষণ ব্যানার্জির বাড়ির মাঠে কবি নজরুল ব্যাডমিন্টন খেলতেন ও ড. সেনগুপ্তের বাড়িতে সকলের সঙ্গে তাস খেলতেন। ...ঐ পাড়ার স্বদেশচন্দ্র চ্যাটার্জি মহাশয়ও ড. সেনগুপ্তের বাড়িতে বহুবার কবি নজরুলের সঙ্গে তাস খেলেছিলেন। ১৯৪১ সালে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় নজরুল উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপূজায় থিয়েটার মঞ্চে কবি নজরুল কিছু বক্তব্য রাখবার সময় ভক্তিভরে মাদুর্গার আবির্ভাবের বর্ণনা দেন ও শক্তিপূজার উৎস ব্যাখ্যা করেন। ...দুর্গাপূজার দিনগুলিতে সকলের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তুলে ধরে পরম আনন্দে অতিবাহিত করেন।"

সময় স্মৃতিকে দুর্বল করে। তাই অঞ্জনকুমার সেনশর্মার অতীতচারণায় কিছুটা দুর্বলতা .ও অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। তাঁর এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে, বক্তব্যের ফাঁকপূরণ করতে জিতেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা পরিপূরকের ভূমিকা নিয়েছে। যেমন—

ক) অঞ্জনকুমার লিখেছেন, "দক্ষিণেশ্বরে অনন্তকুমার সেনগুপ্ত একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বিন্ধ্যবাসিনীতলার কাছে।" তিনি বাড়িটির অবস্থান সুস্পষ্টভাবে বললেও সঠিক ঠিকানা স্মরণে আনতে পারেননি। প্রায় ষাট বছর আগের একটা ঠিকানা স্মরণ না থাকাই স্বাভাবিক। জিতেন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই অনন্তকুমারের ভাড়া বাড়ির ঠিকানা উল্লেখ করে ঐ ফাঁক পূরণ করেছেন।

খ) অঞ্জনকুমার লিখেছেন, সার্বজনীন দুর্গোৎসবটি হত তাঁদের ভাড়া বাড়ির কয়েকটি বাড়ির উত্তরে এক ছোট কারখানার মালিকের বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিতে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, ঐ কারখানার মালিক কে ও ফাঁকা জমিটি কার যেখানে নজরুল এসেছেন। জিতেন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ঐ ফাঁকা জমি ও ছোট কারখানার মালিক তাঁর পিতা পদ্মপলাশ সিংহ (মণ্ডল)। অবশ্য এখানকার দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নজরুলের দক্ষিণেশ্বরে আসা সম্পর্কে উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অসুস্থ অবস্থায় কবি হঠাৎ এখানে-ওখানে চলে যেতেন। কোনোদিন পানিহাটিতে—

> "কোনোদিন বা নজরুলকে পাওয়া যেত দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের এলাকায়, কখনও বা গঙ্গার তীরে। কোথাও তার নির্জন হবার সুযোগ নেই। কেউ না কেউ তাকে চিনে ফেলত, আর একজন চিনলেই ধীরে-ধীরে অনেকে এসে জমত। তারাই উদ্যোগী হয়ে পৌঁছে দিয়ে যেত বাড়িতে।" [৫]

কবির স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে কল্যাণী কাজী লিখেছেন—

> "এই বাড়ির বউ হয়ে আসার পর একটা জিনিস আমি দেখতাম কবি থেকে শুরু করে অনিরুদ্ধ, বাড়ির সব ছেলেরই দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির প্রতি এক অদ্ভুত টান ছিল। আমরা যখন টালার মন্মথ দত্ত রোডের বাড়িতে থাকতাম তখন একদিন দেখি কবি বাড়িতে নেই। চারদিক হুলুস্থুল কাণ্ড। বাড়ির সকলে পাগলের মতো খুঁজছে, উদ্বেগ আর চিন্তায় শাশুড়ির মন আনচান। হঠাৎই খবর পাওয়া গেল হাঁটতে হাঁটতে কবি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি চলে গেছেন। তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হল।

বাড়িতে এসে তিনি যেন অনেক কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু, চিন্তাশক্তি আর বলার মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাচ্ছিলেন না। হঠাৎই চুপ করে গেলেন।" [৬]

॥ ২ ॥

আড়িয়াদহে নজরুল :

কাজী নজরুল ইসলাম যখন কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতে স্বনামধন্য হয়ে ওঠেননি তখন থেকেই আড়িয়াদহের দিল্লিপাড়ায় ফণিভূষণ চ্যাটার্জির পৈতৃক বাড়িতে (২, যদুনাথ মুখার্জি স্ট্রিট, আড়িয়াদহ) আসতেন। এই প্রসঙ্গে অসীম চ্যাটার্জি বলেন, " ফণিভূষণ চ্যাটার্জি আমার দাদু। ফণিভূষণ শ্যালক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। পরিবারিক সূত্রেই মণিভূষণ প্রায়শই আড়িয়াদহে ফণিভূষণের পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন। নজরুলও তখন মাঝে মধ্যে আসতেন ও থাকতেন। সঙ্গীতের প্রতি চ্যাটার্জি পরিবারের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ফণিভূষণের বড় ভাই নেপালচন্দ্র চ্যাটার্জি (নেপাল কথক) ও তাঁর পুত্রদ্বয় হরেকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ এবং ভূপাল চ্যাটার্জির পুত্র সুশীল নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করতেন। সুতরাং আমাদের পরিবারে নজরুলের মত সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি বিশেষভাবে সমাদৃত হত বলে শুনেছি।"

নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভাগবতরত্ন) ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত। তিনি 'নেপাল কথক' নামেই পরিচিত। নেপালচন্দ্রের পুত্র প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (৮৯) স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে বলেন— "আমাদের দিল্লিপাড়ায় পৈতৃক বাড়িতে নজরুল প্রায়ই আসতেন ও দীর্ঘসময় থাকতেন। মামা মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম 'ঘুঘু') ও কাজী নজরুল ইসলাম একই সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলেন মেসোপটেমিয়াতে, তখন থেকেই উভয়ের সাথে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই সূত্র ধরেই আমাদের বাড়িতে নজরুলের আসা-যাওয়া। নজরুল আসতেন war uniform পরে— খাকি হাফ প্যান্ট, খাকি রং-এর হাফ হাতা জামা ও বুট জুতো। নজরুল এলে আবৃত্তি ও গান শোনাতেন। আমরাও শ্রোতা হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকতাম। নজরুলের গলা যেমন উদাত্ত ছিল, স্মৃতিশক্তিও তেমন প্রখর ছিল। তাঁকে কোনও দিন লেখা দেখে গাইতে বা আবৃত্তি করতে দেখিনি। 'বিদ্রোহী' কবিতার মত দীর্ঘ কবিতা তিনি সুন্দর মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। যেসব গান গাইতেন তার কয়েকটা আজও মনে পড়ে। এইসব গান আমরা মামা মণিভূষণের কাছ থেকে শিখি। মামা এইসব গান শিখেছিলেন নজরুলের কাছ থেকে।"

শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রেও মণিভূষণের সঙ্গে নজরুলের বিশেষ বোঝাপড়া ছিল। ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'লাঙল' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেইসময় ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন তুঙ্গে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজির বিধিনিষেধ গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা অমান্য করায় আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ নেয়। অহিংস আন্দোলন চললেও কৃষকদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে। এর প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা অঞ্চলের কৃষকরা থানায় আগুন লাগায় (ফেব্রুয়ারি ১৯২২) এবং ২২ জন পুলিশের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি বলেন, আন্দোলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তাই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধীজির আন্দোলনের এই নৈরাশ্যজনক পরিণতিতে বিপ্লবীরা তাদের সশস্ত্র আন্দোলনকে আবার

সুসংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে অনুশীলন ও যুগান্তর দল যৌথভাবে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এই প্রয়াস বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে নতুন পথ দেখাল। ১৯২৪ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। ১৯২৫ সালের ৯ অগস্ট কাকরি ট্রেন ডাকাতিকে কেন্দ্র করে কাকরি ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করার জন্য বিপ্লবীরা দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায় ও শোভাবাজারে দুটি বোমা তৈরির কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইংরেজ গুপ্তচররা ১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর কেন্দ্র দুটি ঘেরাও করে পিস্তল বোমা সহ এগারো জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা। সুতরাং 'লাঙল' পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয় তখন দেশ উত্তাল।

'লাঙল'-এর প্রকাশিত মোট ষোলটি সংখ্যাতেই নজরুল ইসলামের নাম পরিচালক ও মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় নাম সম্পাদক রূপে ছাপা হয়েছিল। যদিও নজরুলই এই পত্রিকার সবকিছু দেখতেন তবুও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজরোষ থেকে নজরুলকে বাঁচাবার জন্য মণিভুষণের নাম সম্পাদক রূপে ছাপা হত। মণিভূষণ পরবর্তী জীবনে স্বামী মোক্ষানন্দ গিরি নাম গ্রহণ করে ধর্মীয় চিন্তার জগতে নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন।

আড়িয়াদহে অনেক প্রবীন মানুষের ধারনা, নজরুল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর দিন আড়িয়াদহেই ছিলেন এবং সেইদিন এখানে বসেই তিনি দেশবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে একটি গান রচনা করে তাতে সুরারোপ করেন। পরে শোকমিছিলের উদ্যোগ নেন এবং তাতে অংশগ্রহণ করেন। এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ—

> "১৩৩২ সালের ২ আষাঢ় (১৯২৫, ১৬ জুন) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন তখন নজরুল হুগলির বাড়িতেই ছিলেন। পরদিনই তিনি দেশবন্ধুর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'অর্ঘ্য' শীর্ষক একটি গান রচনা করেন। ... এটি দেশবন্ধু শবাধারে মালার সঙ্গে অর্ঘ্য স্বরূপ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।"[৭]

এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় নজরুলের এক বন্ধুর লেখায়।

> "দেশবন্ধু যখন মারা যান তখন কবি এই বাড়িতেই (হুগলির) ছিলেন"।[৮]

ইতিমধ্যে ১৯২০ সালের নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্রিটিশের বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। সারা দেশের সঙ্গে এই ঘটনা আড়িয়াদহের জনজীবনেও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ আড়িয়াদহের অনেক মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। আড়িয়াদহের বরেণ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তিনি ছিলেন আড়িয়াদহ কংগ্রেস সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতা।

১৯৪২ সালে নজরুলের 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে নজরুল এর বহু আগে থেকেই রাজনৈতিক সমাবেশে স্বরচিত গান পরিবেশন করতেন। ১৯২৫ সালে মে মাসের প্রথম দিকে ফরিদপুর কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাশের উপস্থিতিতে তিনি স্বদেশী গান পরিবেশন করেন, তখন থেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির অঙ্গনে আসা-যাওয়া। এই সময়

থেকেই নজরুল মেদিনীপুর, হুগলী, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে নানা রাজনৈতিক সভা সমিতিতে ও আন্দোলনে যোগ দিতেন। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সেই সময়েই নজরুলের সঙ্গে ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই তাঁর বাড়িতে নজরুলের আসা-যাওয়া। হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর কয়েকদিন পর আড়িয়াদহে ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে বসে 'অকাল সন্ধ্যা' নামে একটা গান লেখেন। সেটা ৬ই আষাঢ়। গান লেখার পর শোকমিছিল বের হয়। সেই মিছিলে আমি ছিলাম। শোকমিছিলের পর আরও একটা গান লেখেন—

"খোল মা দুয়ার খোলো
প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো,
দুপুরেই ডুবলো দিবাকর গো।"

হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা যে নির্ভুল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নজরুলের জীবনীকার ও গবেষকের লেখার মধ্যে—

"অকালসন্ধ্যা" গানটি ৬ই আষাঢ় আড়িয়াদহে লেখা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গানটি গীত হয়।

"সবারে বিলায়ে সুধা,
সে নিল মৃত্যু-ক্ষুধা,
কুসুম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো।
তাহারি অস্থি চিরে,
দেবতা বজ্র গ'ড়ে
নাশে ঐ অসুর অসুন্দর গো"।

কবি চিত্তরঞ্জনকে নীলকণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আত্মত্যাগে তিনি দধীচির তুল্য। কবিতাটি ১৩৩২ সালের (১৯২৫) শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গবাণী'-তে প্রকাশিত হয়। এর পাদটীকায় লেখা ছিল, "স্বর্গীয় দেশবন্ধুর শোকযাত্রার গান।" [৯]

৬ই আষাঢ় আড়িয়াদহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মরণে যে শোকমিছিল বেরিয়েছিল তাতে এই 'অকাল সন্ধ্যা' গানটি গাইতে গাইতে নজরুল গ্রামের রাস্তা পরিক্রমা করেন। এই কারণেই সম্ভবত 'বঙ্গবাণী'-তে প্রকাশিত কবিতাটির পাদটীকায় লেখা হয়েছিল 'স্বর্গীয় দেশবন্ধুর শোকযাত্রার গান'।

দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর নজরুল আড়িয়াদহে এসেছিলেন তার উল্লেখ 'নজরুলের স্নেহভাজন বন্ধু'-র লেখায় পাওয়া যায়—

"নজরুল 'অর্ঘ্য' গানটি 'লেখেন ১৩৩২ সালের ৩রা আষাঢ়। দেশবন্ধুর শবাধারে রচনাটি মালার সঙ্গে অর্ঘ্যস্বরূপ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ওই দিনই বিশেষ কারণে আড়িয়াদহের একটি উৎসবে যোগদান করার জন্য রওনা হন শ্রী মণিভূষণের সঙ্গে। পরে একটি গান লেখেন 'অকাল সন্ধ্যা' নাম দিয়ে ৬ই আষাঢ়।" [১০]

আড়িয়াদহ থেকে নজরুল হুগলিতে ফিরে যান। নজরুলের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিখেছেন—

"ওখানে (আড়িয়াদহ) থেকে ফিরেই দেখেন হুগলির নেতৃস্থানীয় ও স্বেচ্ছাসেবকরা স্তব্ধ হয়ে আছেন। কবি খালি পায়ে ঢুকে আবেগের সঙ্গে গানটি গাইতে লাগলেন

খালি গলায়—

'খোলো মা দুয়ার খোলো/ প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো,/ দুপুরেই ডুবলো দিবাকর গো'। তারপরেই খালি পায়ে মিছিল ক'রে সারা হুগলী শহর পরিক্রমা করা হ'ল।"[১১]

সুতরাং ধরে নেওয়া যায় উপরোক্ত গানটি আড়িয়াদহে লেখা।

আড়িয়াদহের হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (৮৯) ও লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (৮৯) উভয়েই বলেছেন, আড়িয়াদহের 'মিলনী'র মাঠে (বর্তমানে যেখানে আড়িয়াদহ হাসপাতাল গড়ে উঠেছে) নজরুল ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিস্তৃত স্মৃতিচারণায় বলেছেন, "আমার পাঠ্যজীবনে যুবক কাজী নজরুলকে এক মিছিলে যেতে দেখেছি। আড়িয়াদহের বর্তমান যদুনাথ মুখার্জি স্ট্রিট এবং জয়কৃষ্ণ ঘোষাল রোড় ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে সখের বাজারের অভিমুখে। মাথায় একরাশ কোঁকড়ান চুল, কাঁধে ছোট হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে স্বদেশীগান গাইতে গাইতে। সঙ্গে একদল ছেলে বুড়ো ও যুবক চলেছে।

"১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আড়িয়াদহের মিলনীক্লাবের হৈমন্তিক উৎসবে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন কাজী নজরুল। 'মিলনী'র সভায় কবি 'সব্যসাচী' থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন। মিলনীতে শরৎচন্দ্রের আগমন উপলক্ষে কবি তাৎক্ষণিক একটি কবিতা রচনা ক'রে আবৃত্তি করেন। তার প্রথম লাইন— 'আজ কোন্ শরতে পূর্ণিমার চাঁদ আইলা ধরণীতে'— ।

"১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে মিলনীর হৈমন্তিক উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন নেতাজি সুভাষ এবং সভাপতি বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল এই সভায় 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি পরিবেশন করেন। মিলনীর পক্ষ থেকে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের স্মৃতি রক্ষার্থে শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে একটি টাকার তোড়া তুলে দেওয়া হয়।

"আড়িয়াদহ দিল্লিপাড়ার পরম শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত কথক নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয় মণিভূষণ মুখার্জী কাজী নজরুলকে আড়িয়াদহে আনেন। আড়িয়াদহে কবির সহিত গ্রামের শ্রদ্ধেয় জমিদার তনয় ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়ের সখ্যতা ও হৃদ্যতা হয়। ব্যোমকেশবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রণবের বিবাহে কাজী পদ্য লিখেছিলেন। কবি পত্নী প্রমীলাদেবী আড়িয়াদহের অনন্তকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রীর জ্যাঠতুতো দিদি ছিলেন। কবি পুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হয় কল্যাণী দেবীর সহিত আড়িয়াদহের ড. সেনগুপ্তের বাড়ি থেকে।"

ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের আড়িয়াদহ কালাচাঁদ স্কুলের নিকট বাড়িতেও (১১, এম.এম.ফিডার রোড, আড়িয়াদহ) নজরুল বহুবার এসেছেন। এই প্রসঙ্গে ড. মানব সেনগুপ্ত বলেছেন— "সম্ভবত ১৯৪৩-৪৪ সালে ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের আড়িয়াদহের বাড়িতে নজরুল কয়েকদিন ছিলেন। সেই সময় এই বাড়িতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ড. মেঘনাদ সাহা নজরুলকে দেখতে আসেন।

"শেফালী সেনগুপ্তা (মণিমা) ছিলেন ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের ভাই নারায়ণ সেনগুপ্তের স্ত্রী। সেই সূত্রে শেফালীদেবীর সঙ্গেও নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সুগায়িকা ছিলেন। তাঁর গান শুনে নজরুল এতই তৃপ্ত হয়েছিলেন যে, স্বেচ্ছায় তাঁকে ভক্তিগীতি শিখিয়েছিলেন। নজরুলের মানসিক বিপর্যয় আকস্মিকভাবে ঘটেনি, ধীরে ধীরে তিনি দুঃখজনক পরিণতির দিকে এগিয়েছেন। যখন নজরুল সবেমাত্র রোগাক্রান্ত হন তখন

আড়িয়াদহের বাড়িতে বসে শেফালীদেবীর খাতায় লিখেছিলেন—

"আমি যেমন ছিলাম তেমনি ভাল আছি
হৃদয় পদ্মে স্থান পেল আজি
মনের মৌমাছি।"

।। ৩ ।।

বেলঘরিয়ায় নজরুল :

বেলঘরিয়ার সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ ছিল। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা যাবার পথে তিনি প্রায়শই বেলঘরিয়ার চণ্ডীচরণ মিত্রের বাড়িতে আসতেন। চণ্ডীচরণ মিত্র কবিতা ছাড়াও অনুবাদ সাহিত্য ও ভ্রমণকাহিনীতে যথেষ্ট কৃতিত্বের ছাপ রেখেছিলেন। তখনকার বেলঘরিয়াতে বৈদ্যনাথ ঘোষালের বাড়িতে 'রসচক্র' নামে যে সাহিত্যের মজ্‌লিস বসত, সেখানে কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়াও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক আসতেন। বেলঘরিয়ার সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব শিবপ্রসাদ ঘোষাল (৯১) বলেছেন— "... সেই সময় কবি চণ্ডীচরণ মিত্রের উদ্যোগে বেলঘরিয়া এম ই স্কুলে (বর্তমানে বেলঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়) বছরে একটা পিকনিক হত। এই পিকনিকের দিন কবি সম্মেলন হত। এই কবি সম্মেলনে জলধর সেন, হেম বাগচী, নরেন দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, গোলাম মুস্তাফা, দিনেশ দাশ প্রমুখ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক-শিল্পীবা আসতেন। আমি কবি চণ্ডীচরণ মিত্রের নির্দেশে ঐ কবিসম্মেলনের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এখনও নজরুলের উচ্চ হাসি কানে বাজে।"

স্মৃতি সততই সুখের। স্মৃতির পাশাপাশি বিস্মৃতির প্রক্রিয়া নিরন্তর চলেছে। জীবনের সব ঘটনা মনে রাখা সম্ভব নয়। কারণ আমরা সীমিত স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া সব ঘটনা আমাদের জীবনে সমান প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজনীয় ঘটনাকে মনে রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিস্মরণ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় ঘটনা নির্ধারণ বা শ্রেণিকরণ হয় আমাদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। যেসব প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার এই প্রসঙ্গে নিয়েছি তাঁদের কাছে নজরুল-স্মৃতি জীবনের সম্পদ বলেই আজও ভাস্বর। আজও প্রয়োজনীয়। বয়সের ভার ও শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা স্মৃতিচারণায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাছাড়া বর্তমান নিবন্ধে নজরুল-গবেষক ও জীবনীকারদের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এঁদের স্মৃতিচারণার বিশ্বস্ততাকে প্রমাণ করে।

এইসব প্রবীণ মানুষজনের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় কামারহাটি পৌরাঞ্চলের সঙ্গে নজরুলের আত্মিক সম্পর্কের কথা। পৌরএলাকার সঙ্গে কবির নিবিড় সংযোগ ও সম্পর্কের কথা চিন্তা করে পৌরসভার নবনির্মিত মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে 'নজরুল মঞ্চ'। তাই নামকরণের নেপথ্যের ইতিহাস আমাদের একান্ত গর্বের। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের কেন্দ্র হিসাবে এই মঞ্চ আজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কবি নজরুল ইসলাম ও কামারহাটি পৌরসভার শতবর্ষ ঘটনাক্রমে একই সময়ে উপস্থিত। তাই যখন একদিকে আমাদের জাতীয় জীবনে নজরুলের উজ্জ্বল উপস্থিতির শতবর্ষ সারা দেশ জুড়েই উদ্‌যাপিত হচ্ছে, আমরাও আমাদের পৌরাঞ্চলের কাছের মানুষ নজরুলের জন্মশতবর্ষে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

যাঁরা সাম্য, ন্যায় ও নীতির ওপর সমাজকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং যাঁরা ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাখি বন্ধনের মাধ্যমে ভারতের ঐক্য ও সংহতির ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করার প্রয়াসী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম। নজরুল শোষণমুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখনও অনার্জিত। তাই কবির স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে তাঁর সাম্যবাদী জীবনাদর্শ ও মানবমুক্তির বাণীকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কালের গণ্ডী অতিক্রম করে নজরুলের দৃপ্ত উপস্থিতি আগামী প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত ও প্রাণিত করবে।

(কামারহাটি পৌরসভার শতবর্ষের স্মারক গ্রন্থ থেকে সংকলিত, সম্পাদনা অধ্যাপকঅমরনাথ ভট্টাচার্য)

উৎস :

১। নজরুলকে যেমন দেখেছি— শামসুল নাহার আহ্‌মদ
২। কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা— মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
৩। নজরুলের সঙ্গে কারাগারে— নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪। শত কথায় নজরুল— কল্যাণী কাজী সম্পাদিত
৫। জ্যৈষ্ঠের ঝড়— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬। প্রসঙ্গ ঃ শতবর্ষে বিদ্রোহীর মর্যাদা— কল্যাণী কাজী
৭। নজরুল-চরিতমানস— ড. সুশীলকুমার গুপ্ত
৮। কাজী নজরুল— প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
৯। নজরুল-চরিতমানস— ড. সুশীলকুমার গুপ্ত
১০। কাজী নজরুল— প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
১১। কাজী নজরুল— প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং সাক্ষাৎকার
১২। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার

লেখক পরিচিত : দর্শন শাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক, পি.এইচ.ডি, কামারহাটি পৌরসভার মুখপত্র 'পুরপথিক'-এর সম্পাদক, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক

ভাটপাড়া ও হালিসহরে নজরুল

বাঁধন সেনগুপ্ত

অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর মহকুমার উত্তরাংশের সঙ্গেই কাজী নজরুল ইসলামের যোগাযোগ ছিল বেশি। তুলনায় জেলার দক্ষিণাংশের সঙ্গে কিছুটা কম। আসলে কলকাতার কাছাকাছি উত্তরাংশের অঞ্চলগুলিতে তখন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ও একাধিক বিখ্যাত লেখকদের অবস্থানভূমি ছিল জেলার শহরতলী সংলগ্ন এই বিশাল অঞ্চল। বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, বেলঘরিয়া, পানিহাটি, বারাকপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া বা হালিসহর দীর্ঘকাল বাংলাসাহিত্যের বহু দিক্‌পাল লেখকের পদচারণায় ধন্য হয়ে এসেছে। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেম বাগচী, মোহিতলাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত এই অঞ্চলের সাহিত্য ও তার ইতিহাস তাই চিরকালীন বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। কাজী নজরুল ইসলামেরও তাই একাধিকবার আগমন ঘটেছিল এই জেলার উত্তরাংশে। সেই ঐতিহ্যের আকর্ষণে তিনি বারাকপুর মহকুমার নানাপ্রান্তে ছুটে এসেছিলেন।

বস্তুত অন্যান্য কবি বা লেখকদের এই জেলায় আগমনের কারণ ছিল মূলত সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যিক সংসর্গ। যেমন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র আসতেন লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে হালিসহরে ও নৈহাটিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আসতেন সমকালীন সাহিত্য জগতের রথী-মহারথীরা। পানিহাটিতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ও সাহিত্যচর্চা পেনেটির যে গৌরব বাড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজী নজরুলের এই জেলার উত্তরাংশে আগমনের কারণ শুধু সাহিত্য সংসর্গ বা সাহিত্যচর্চাই নয়, এই জেলার রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য ও বৈপ্লবিক তৎপরতাই ছিল নজরুলের একাধিকবার আগমন ও অবস্থানের কারণ। আসলে নজরুলের ব্যক্তিগত জীবন ছিল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ। এমন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক যোগাযোগ সেকালে আর কোনো কবি বা লেখকের ছিল না। ফলে নজরুলের এই জেলায় উপস্থিতি ও কর্মচাঞ্চল্য নানাকারণেই ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। বিশের দশকের গোড়ায় নজরুল প্রথম এই জেলায় এসেছিলেন।

হালিসহরের খ্যাতনামা বিপ্লবী পুরুষ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বিশের দশকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচারক এবং বাঙলার বিপ্লববাদের অন্যতম প্রধান সংগঠক। 'যুগান্তর' দলকে তিনি ভাটপাড়া এলাকায় সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত করেছিলেন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন নৈহাটি-ভাটপাড়া অঞ্চলের বিশ্বস্ত সংগঠক বোঁচাদা (রায়), হরনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নরোত্তম দাশ ঘোষ, নৈহাটির শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ

চট্টোপাধ্যায়, নির্মল সুর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিপিন গাঙ্গুলির সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় শিয়ারসোল স্কুলে পড়বার সময়ই নজরুলের প্রথম পরিচয় ঘটে শিক্ষক নিবারণ ঘটকের মাধ্যমে। সেটা ১৯১৬-১৭ সালের ঘটনা। আত্মগোপনকারী হিসেবে শিয়ারসোল রাজবাড়ির নতুন কর্মচারী 'রণেন গাঙ্গুলি' নামে ছদ্মবেশী বিপিন বিহারীকে নজরুল তখনই চিনতেন। বিপিন গাঙ্গুলিকে ভাটপাড়ায় পরে বিপ্লবীরা প্রায়ই গোপনে নিয়ে আসতেন। বিশের দশকের মাঝামাঝি ভাটপাড়ার বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেদিনের 'তরুণ সঙ্ঘ'। নজরুলকেও হুগলি থেকে নৌকোয় চাপিয়ে ভাটপাড়ায় নিয়ে আসতেন এই সঙেঘর কর্মীরা। তাঁর মুখে কবিতা ও গান শুনে ভাটপাড়ায় রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে বছরই নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস 'হীনজাতির জলচল আন্দোলন' প্রস্তাব সমর্থন করেন। একে কেন্দ্র করে সে বছর গ্রীষ্মকালে ভাটপাড়া নৈহাটি অঞ্চলের মাঝখানে গঙ্গারধারে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের পাশাপাশি দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা বিরাট শামিয়ানা টাঙিয়ে গঙ্গারধারে ভাটপাড়ায় 'নিখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন' এর ব্যবস্থা করেন। পাশেই বলরাম সরকারের ঘাটে নব্যপন্থীরা অধ্যাপক নরোত্তম দাশ ঘোষের সভাপতিত্বে '২৪ পরগণা জাতীয় সম্মেলন' আহ্বান করেছিলেন। 'নমঃশূদ্রের জলচল' প্রস্তাবের সমর্থনে নবীনদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন একাধিক পণ্ডিতের দল। কিন্তু ভাটপাড়ার প্রাচীনপন্থীদের নেতা মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় গণ্ডগোলে সম্মেলন ভেঙে যায়। তরুণদের সম্মেলনে নজরুল স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। কবি তাঁর কবিতা ও গানের মাধ্যমে মানুষের অধিকার বিষয়ে সম্মেলনে সকলকে সচেতন করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বহিরাগত পণ্ডিতেরা প্রকাশ্যে সেদিন নজরুলের বক্তব্য সমর্থন করে নব্যপন্থীদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এর ফলে কট্টরপন্থী ব্রাহ্মণদের এলাকা ভাটপাড়ায় এলাকার মানুষও সেদিন নজরুলকে সমাদরে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেননি। মহকুমার সর্বত্র তখন নজরুলের জনপ্রিয়তা।

এই মহকুমার গরিফায় নজরুল আসতেন প্রধানত কালীপতি মজুমদার, মণি সেন ও সুবোধ মজুমদারের বাড়িতে। সেখানে পাশাপাশি সাহিত্যের আড্ডা এবং বিপ্লবী গোপন সংগঠনের কাজকর্মে নজরুল উৎসাহ প্রদান করতেন। আড্ডায় রাত হয়ে গেলে সেনপাড়ার যুবকেরা গরিফার রামঘাটে কবিকে পৌঁছে দিতেন। নৌকোয় হুগলিতে গিয়ে নজরুল যখন পৌঁছতেন তখন হয়তো রাত বারোটা। গরিফার দক্ষিণ সংলগ্ন নৈহাটির বরদা ব্রিজের ওপারে ফাঁকা প্রায় জনশূন্য মাঠে ভাটপাড়ার তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা এসে তখন জড়ো হতেন। কাছাকাছি জঙ্গলে গোপনে ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে নজরুলকেও প্রায়ই আসতে হত। বিপ্লবী নির্মল সুর ছিলেন নজরুলের গানের সঙ্গী এবং নজরুলের দ্বারা সেদিনের অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত।

অন্যদিকে, হালিসহর ছিল বিপিন বিহারীর পিতৃভূমি। এখানে এলে তিনি স্থানীয় বিপ্লবী যুব সমাজে 'যুগান্তর' এর সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিয়মিত বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দিতেন। বিশের দশকে 'তরুণ সঙ্ঘ' একবার গঙ্গা তীরবর্তী হালিসহর উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন বলে শোনা যায়। তখনকার পরিস্থিতিতে যুবসমাজের আশু কি কি

করণীয় এ বিষয়ে সভায় আলোচনা হবার কথা। বিপিনবিহারী সে সভায় তাই নজরুলকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন। নজরুল সেই সভায় যোগ দেবার ফলে মুহূর্তের মধ্যে তিনিই হয়ে ওঠেন সভার মধ্যমণি। তাঁর বক্তৃতা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। সভাশেষে কবি সকলের সঙ্গে ঠোঙায় মুড়ি ও তেলেভাজা খাওয়ায় অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। রামপ্রসাদ ভিটায় কালীমন্দিরে তিনি একাধিকবার এসেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর রচিত শ্যামসঙ্গীত সে কালেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অনেকের মতে, স্ত্রী প্রমীলার অসুস্থতার পর দেবদেবীর কাছে বিভিন্ন যে সব ধর্মস্থানে বা মন্দিরে নজরুল প্রার্থনার জন্যে যেতেন রামপ্রসাদের ভিটা অর্থাৎ কালীমন্দির এবং বালিদাঘাটায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ছিল তার অন্যতম। •

এছাড়া হাজিনগর জুট মিলে ধর্মঘটের সময় মিলগেটের সামনে (১৯২৯) ও বস্তিতে বস্তিতে ও মিলের সামনে সমাবেশে নজরুল ধর্মঘটি শ্রমিকদের সমর্থনে একবার স্বয়ং এসে গান ও আবৃত্তি শুনিয়ে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

সৌজন্য :
বারাকপুরের সেকাল একাল (২য় খণ্ড), সম্পাদনা- কানাইপদ রায়
(লেখকের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ গৃহীত হয়েছে।)

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট লেখক ও নজরুল গবেষক

নৈহাটি ও গরিফায় নজরুল

দীপ্তিময় রায়

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবিতকালে যখন প্রতিভায় ভাস্বর ছিলেন এবং তাঁর কবিতার কথায় ও ছন্দে, গানের অনির্বাচনীয় ভাবে ও সুরে 'বিদ্রোহী' কবির শিরোপা নিয়ে স্বাধীনতা ভাবনায় দেশবাসীর প্রাণে আলোড়ন তুলেছিলেন, সেদিন দেশের মানুষ তাঁর সেই উদাত্ত অগ্নিঝরা সঙ্গীত ও অগ্নিগর্ভ গৈরিক নিঃস্রাবের মত গনগনে কবিতা তাঁর গলাই শুনে ও নিজেদের কণ্ঠে নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল পরাধীনতার শিকল ভাঙার অঙ্গীকারে। এরই সঙ্গে ছিল কবির নানা ভাবের নানা সুরের গীতি-বৈচিত্র্য। বাস্তবিক বাংলাব মানুষের প্রাণ-বীণা সেদিন এমন এক অপূর্ব হিল্লোলে বেজে উঠেছিল যা ছিল অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য।

সেদিন বাংলার এক কোণের ছোট জনপদ উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটি ও তার সংলগ্ন গ্রাম গরিফার বুকেও নজরুলী হাওয়া এসে লেগে ছিল। শুধু হাওয়া লাগা নয়, বিদ্রোহী কবির আগমনে. ধর্ম, সাহিত্য ও রাষ্ট্র বিপ্লবের অন্যতম পীঠভূমি এই জনপদ সেদিন জাগরণের গানে কেবল আনন্দাপ্লুতই হয়নি, ধন্যও হয়েছিল।

নৈহাটি গরিফার মানুষ নৈহাটিতে কবি নজরুলকে প্রথম ভিড় করে দেখেছিল নৈহাটি রেল স্টেশন চত্বরে। কবি ছিলেন কয়েদির বেশে। ১৯২২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'-তে কবির 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশ করার জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এক বছরের সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দেয়। প্রথমে তাঁকে বিশেষ শ্রেণির কয়েদি হিসাবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলেও কয়েকমাস পরে অজ্ঞাত কারণে কবিকে সাধারণ কয়েদির বেশে হুগলি জেলে নিয়ে আসা হয়। সেটা ১৯২৩ সাল। তাঁকে কলকাতা থেকে হুগলি জেলে আনার সময় গাড়ি বদলের জন্য নৈহাটি স্টেশনে নামানো হয় এবং সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর নৈহাটি থেকে ব্যান্ডেল যাওয়ার ট্রেনে করে হুগলি ঘাট স্টেশন নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে হুগলি জেলে।

বিদ্রোহী কবিকে দেখতে সেদিন নৈহাটি-গরিফার অনেক মানুষ তিন নম্বর প্লাটফর্মে ও স্টেশনের বাইরে জমায়েত হয়েছিল। লম্বা-চওড়া দেহ, আয়ত নয়ন, একামাথা ঘন বাবরি চুল কবিকে পরানো হয়েছিল সাধারণ কয়েদির বেশ ফতুয়া ও আন্ডার প্যান্ট। হাতে ছিল হাতকড়া। কোমরে দড়ি। কবিব শরীর জুড়ে ছিল কারাবাসের ক্লান্তি, তবু তাঁর চোখ দুটি ছিল উজ্জ্বল।[১]

হুগলি জেলে থাকার সময় বিদ্রোহী কবি ইংরেজ সরকারের জেলে আমানুষিক

১। সেদিনের কথা স্মৃতির পর্দা তুলে জানিয়েছেন নৈহাটির রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এক কালের যুগান্তর পার্টি করা বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলির শিষ্য।

ব্যবহারের প্রতিবাদে আমরণ অনশন করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অনশন আরম্ভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তখনই চুঁচুড়া-হুগলি ও তার আশপাশে এবং গঙ্গার এপারে নৈহাটি-গরিফা ও তাঁর আশপাশে আদরণীয় কবি হয়ে ওঠেন বরণীয়।

হুগলি জেলের ঘটনার পর নজরুলকে বিশেষ কয়েদির মর্যাদা দিয়ে বহরমপুর জেলে বদলি করা হয়, তারপর মেয়াদ পূর্ণ হবার কিছুদিন আগেই ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এরপর ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কুমিল্লার গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর বিবাহের ফলে সমাজ সংসার বিরূপ হয়ে গেলে নজরুল প্রথম দিকে একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েন, তার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিরুপতা তো ছিলই। তখন হুগলির স্বনামখ্যাত বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের চেষ্টায় কবি হুগলিতে এসে স্ত্রী ও শ্বাশুড়িকে নিয়ে বাস করতে থাকেন। কবি হুগলিতে হামিদুল নবি মোক্তারের বাড়িতে ছিলেন।

নজরুলের হুগলিতে বাস একবছরের কিছু বেশি সময়। তখন বহুবার তিনি নৈহাটি ও গরিফায় এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এখানে আসা তাঁর কেবল ঘুরে যাওয়া, আসরে গান গাওয়া এই সব শুধু মাত্র ছিল না। সাহিত্য আলোচনা ও রাজনীতি চর্চা ছিল। চুঁচুড়ায় থাকতেন কবি ও সাহিত্যিক সুবোধ রায়। নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল 'ধূমকেতু' মারফত। সুবোধ রায়ের পৈতৃক বাড়ি ছিল নৈহাটির অটল বিহারী সরকার রোড ও মিত্রপাড়া ব্রাঞ্চরোডের সংযোগস্থাল। বাড়ির নম্বর ৭ মিত্রপাড়া ব্রাঞ্চ রোড। জীর্ণদশায় দাঁড়িয়ে আছে ঐ বাড়ি। সুবোধ রায়ের পিতা ডাঃ গুরুপ্রসন্ন রায় ঐ বাড়িতে থাকতেন। পরে তিনি চুঁচুড়ায় গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকলে নৈহাটির বাড়ি খালিই থাকত। জানা যায় ঐ বাড়িতে কিছুদিন নৈহাটি পুরসভার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চলেছিল। যতদূর জানা যায় ডাঃ গুরুপ্রসন্ন রায়ের ঐ বাড়িতে কয়েকজন বিখ্যাত লোকেদের আগমন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু এন্ড্রুজ ও বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির নাম উল্লেখযোগ্য। নৈহাটির ঐ বাড়িতে নজরুল সুবোধ রায়ের সঙ্গে বার কয়েক এসেছিলেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার সে সময় ডাঃ গুরুপ্রসন্ন রায়ের নৈহাটির বাড়িতে নজরুলের সঙ্গে মিলিত হতেন। হেমন্তকুমার কৃষ্ণনগর থেকে নৈহাটিতে তাঁর আত্মীয়র বাড়ি আসতেন। সুবোধ রায়ের সঙ্গে সেই বাড়ির আত্মীয়তা ছিল। কখনও হেমন্ত এসেছেন জানতে পারলে নজরুল সুবোধ রায়কে সঙ্গে নিয়ে নৈহাটিতে আসতেন। তাছাড়া সে সময় নৈহাটির প্রবীণ শিক্ষাবিদ কবি ও সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, গরিফার কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ এঁরাও ঐ বাড়িতে নজরুল এলে আসতেন। সুবোধ রায় ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে প্রীতি-বন্ধন ছিল। নৈহাটিতে খগেন্দ্রনাথ-দের 'খেয়ালী' নামে একটি আসর বসত। তাঁদের একটি সাহিত্য পত্রিকাও বেরোত 'খেয়ালী' নামে। কবি নজরুল 'খেয়ালী'র আসরেও নিমন্ত্রিত হতেন বলে জানা যায়। তিনি নৈহাটিতে এলে ঘরোয়া ভাবে গানের আসর বসত, তাঁর গান শুনতে লোকে ভিড় করত। এছাড়া ওঁদের নিজেদের মধ্যে একান্তে রাজনীতি চর্চাও হত। সে সময় রাজনীতি চর্চা বলতে বোঝাত দেশোদ্ধারের কথা, স্বাধীনতার কথা ও তার রূপদানের জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা।

বিদ্রোহী কবি তখন প্রলয় বিষাণ বাজিয়ে গান গাইছেন আর বিদ্রোহ-চেতনার আগুন

জ্বালা কবিতার পাশে প্রেমের গান 'গজল' লিখছেন। দিলীপকুমার রায় নানা সভায় নজরুলের লেখা সেই সব গান গেয়ে অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করে চলেছেন।

এরই মধ্যে নজরুল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন এবং ভুগালেনও বেশ কিছুদিন। কবির সঙ্গে দেখা করতে এসে একদিন হেমন্তকুমার তাঁর ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, "কৃষ্ণনগরে থাকবে চল। সেখানে শরীরও সারবে আর সক্রিয় রাজনীতিও করবে।" নজরুল হেমন্তকুমারকে আগেই জানিয়েছিলেন যে তিনি মনে করেছেন সক্রিয় রাজনীতিতে আসবেন।

নৈহাটি ও হুগলিতে হেমন্তকুমারের সঙ্গে আলোচনার ফলেই হেমন্তকুমারের পরামর্শে নজরুল 'লেবার স্বরাজ পার্টিতে' যোগ দেন এবং সাপ্তাহিক 'লাঙল' পরিচালনার দায়িত্ব ভার নেন। হেমন্তকুমারের প্রভাবে কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাস করার আগেই হুগলিতে থাকতেই ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে 'লাঙল' বের হয়।

মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও খাদি আন্দোলনের দ্বারা দেশে স্বাধীনতা আসবে কি আসবে না ও সম্বন্ধে সংশয় নিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেবার আগে কবি তাঁর অন্যতম বিখ্যাত 'চরকার গান' কবিতাটি লিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্য ও নেতাজিসুভাষের সহকর্মী বাংলার প্রথম শ্রমিকনেত্রী সেকালের চটকল শ্রমিকদের 'মাইরাম' সন্তোষ কুমারী দেবী (গুপ্তা) ছিলেন গরিফার প্রসিদ্ধ রায় পরিবারের কন্যা এবং গরিফা সংলগ্ন গৌরীপুর চটকলই বাংলার চটকল শ্রমিক আন্দোলনের আদিযুগে তাঁর শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্র ছিল। সে যুগে এই স্বনাম খ্যাতা জননেত্রীর সঙ্গে বিদ্রোহী কবির পরিচয় হয় দেশের প্রথম মহিলা সম্পাদিকার দ্বারা প্রকাশিত এক পয়সা দামের প্রথম শ্রমিক সাহিত্য পত্রিকা 'শ্রমিক'-এর সূত্রে। শ্রমিক নেত্রী নিজেই 'শ্রমিক' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন।

মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় গরিফাতে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে এবং কলকাতার ডক্টরস্ লেনের এক গৃহে সন্তোষ কুমারী চরকা ও তাঁত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গরিফায় তাঁর মা সমাজ সেবিকা নগেন্দ্রকুমারীর তত্ত্বাবধানে গ্রামের দুস্থা মেয়েদের দ্বারা চরকায় সুতো কাটা হত। জানা যায় শ্রমিক নেত্রী সন্তোষ কুমারী দেবীর অনুরোধে কবি নজরুল কলকাতায় নেত্রীর স্থাপিত চরকা ও তাঁত যন্ত্রের কাজ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'চরকার গান' কবিতাটি লেখেন। কবি স্বয়ং এই কবিতা আবৃত্তি করে গান্ধীজিকেও শুনিয়েছিলেন।

শ্রমিকনেত্রী সন্তোষ কুমারী দেবী ও তাঁর শ্রমিক পত্রিকা গোষ্ঠী সে সময় বিদ্রোহী কবি নজরুলের কেবল গুণগ্রাহী ছিলেন তাই নয়, তাঁর নজরুল রচনার প্রচার ব্যাপারেও সচেষ্ট ছিলেন। তখন রাজরোষের ভয়ে বহু প্রকাশকই কবি নজরুলের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে ইতস্তত করত, এমন কি গোপনে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেও আগে বিজ্ঞাপন দ্বারা জানিয়ে প্রকাশ করতে সাহসী হত না। সাপ্তাহিক 'শ্রমিক' প্রকাশিতব্য নজরুল কাব্যগ্রন্থের অগ্রিম সংবাদ পত্রিকার অঙ্গ হিসাবে সংবাদ আকরে ছেপে জানাত, যেমন ১৯২৪-এর ২৮ সেপ্টেম্বরের পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল—

"নতুন বই— অগ্নিকবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ভাঙার গান' ও প্রলয়ঙ্কর' এই দুইখানি নূতন বহি এক সপ্তাহের মধ্যেই বাহির হইবে। অন্যান্য বহির ন্যায় বাঙালির নির্জীব মনে এ দুইখানি বহিও যে অপূর্ব বলের সঞ্চার করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা উহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষায় রহিলাম।" 'ভাঙার গান' প্রকাশ হলে ইংরেজ সরকার তাকে নিষিদ্ধ করে বাজেয়াপ্ত করে।

নৈহাটির মিত্রপাড়ার কিছু উত্তরে গরিফার ঘোষ পাড়ায় থাকতেন কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। তিনি কবি সুবোধ রায়ের বন্ধু ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ সেকালের একজন বিশিষ্ট কবি ও প্রবন্ধকার। বাংলা অনুবাদ কাব্যের ক্ষেত্রে অন্যতম পুরোধা কবি হিসাবে তাঁর বিশেষ স্থান আছে। বাংলার কবি কুলের মধ্যে কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ হলেন তৃতীয় কবি যিনি সুললিত ভাষায় ও ছন্দে ওমর খৈয়ামের 'রোবাইয়াৎ'-এর কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৯১৮) নজরুলের 'রোবাইয়াৎ'-এর অনুবাদের অনেক আগে। নজরুল বিজয়কৃষ্ণের 'রোবাইয়াৎ-এর অনুবাদ ও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা পড়ে থেকেই জানতেন ও তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন।

নৈহাটিতে সুবোধ রায়ের পৈতৃক গৃহে নজরুলের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। তাঁর স্থিতধী স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও তাঁর সঙ্গে কাব্য, সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে উদার মনের মানুষ নজরুল বিজয়কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি ওঁকে 'বিজয়দা' বলে সম্বোধন করতেন। একদিন কবি নজরুল কোন এক জায়গা থেকে সস্ত্রীক হুগলির বাসায় ফিরছিলেন। নৈহাটি স্টেশনে তাঁরা নৈহাটি ব্যান্ডেলের ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরবেন. হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে। আনন্দে হৈ হৈ করে উঠেছিলেন আত্মভোলা কবি। প্রমীলা দেবীকে বলেছিলেন, "ইনি বিজয় দা, প্রণাম কর"। বলে নিজেও প্রণাম করেছিলেন।

এমনভাবে যে মানুষ চকিতে আপন করে নেয়, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানায়, তাঁকে ভাল না বেসে কেউ পারে কি? কবি নজরুলের চরিত্রের এ ছিল বিশেষত্ব।

আরও এক ছুটির দিন বিজয়কৃষ্ণের ঘোষপাড়ার বাড়িতে নজরুল হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কাছে বেদ ও উপনিষৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেবেন, দরকার হলে পাঠও নেবেন। তাই বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে চান। তাঁরা ভাটপাড়ায় গিয়েছিলেন কিন্তু বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের নানা ঘটনাবলী নিয়ে নজরুল বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের গরিফার এই বাড়িতে নজরুল এসেছিলেন
ছবি : রঘুনন্দন দে

কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের বাড়ি আসা ছাড়াও নজরুল আরও কয়েকবার গরিফার এসেছিলেন। বরং বলা ঠিক যে গরিফার উৎসাহী কিশোর ও যুবকরা কবিকে তাঁদের গ্রামে নিমন্ত্রণ

করে নিয়ে আসেন এবং অনাড়ম্বর সম্বর্ধনাও জানানো হয় কবিকে। তখন গরিফা থেকে কয়েকজন ছাত্র হুগলির স্কুলে পড়তে যেতেন। তাঁরা কোন কোন দিন বিকালে বাড়ি ফেরার সময় দেখতেন হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের মাঠে কিম্বা ইমামবাড়ার উঠানে কবি নজরুল আসর জমিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন। তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গান শুনতেন। ঐ ছাত্ররা ঠিক করেন কবিকে গরিফার নিয়ে আসবেন। তখন গ্রামের উৎসাহী যুবকদের মধ্যে কাশীপতি মজুমদার, মনোনীত সেন ও অন্যান কনিষ্ঠরা কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ও গ্রামের সমাজনেত্রী নগেন্দ্রকুমারী দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে কবিকে গরিফায় নিয়ে অসেন। নজরুল প্রথমে গরিফার সেন পাড়ায় সুবোধ মজুমদারদের বৈঠকখানা ঘরে এসে আসর জমান। তারপর কাশীপতি মজুমদারদের দোতলার ঘরে তাঁর গানের আসর বসে। ঐ আসরে একটি ছোট মেয়েকে কোলে করে তিনি নেচে নেচে গেয়েছিলেন— "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া" গানটি।

কাশীপতি মজুমদারের এই গৃহে (গরিফা) ঘরোয়া আসরে নজরুল একটি বাচ্চা মেয়েকে কোলে করে নাচতে নাচতে 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি গেয়েছিলেন (১৯২৫)

গরিফার রায়পাড়ায় শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী দেবীর পৈতৃক গৃহেও কবি এসেছিলেন এবং নেত্রীর মা নগেন্দ্রকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত চরকার কাজ দেখেন। শোনা যায় নগেন্দ্রকুমারী কবির কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা দিয়ে তাঁকে বরণ করেছিলেন।

সম্ভবত কবি নজরুল গরিফার শেষবার এসেছিলেন ১৯২৫ সালের ৫ নভেম্বর রাস পূর্ণিমার রাত্রে। তিনি রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ হুগলির বাসা থেকে এখানে আসেন এবং তাঁকে রাসতলায় নিয়ে গিয়ে স্বাগত জানানো হয়। গরিফা চড়কতলার ঐ রাসতলা এখন আর নেই।[১]

গ্রামের মানুষ সেদিন সেখানে কবি নজরুলকে দেখতে ভেঙে পড়েছিল। কবি প্রথমেই উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বলবীর, চিরউন্নত মম শির'। তারপর একে একে তিনি অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন— দেশাত্মবোধক গান ও ভক্তিগীতি। সভার শেষে কবিকে রায় সাহেব বলরাম সেনের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় এবং খাওয়া দাওয়ার পর রাত বারোটা নাগাদ গ্রামের লোকেরা তাঁকে গরিফা স্টেশনে নৈহাটি ব্যন্ডেল লোকালে তুলে দেয়।

নৈহাটির বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও কবি খগেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে কবি নজরুল যে সময়

১। চড়কতলার মাড়িপোড়া পুকুরের পশ্চিমে খোলা জমিতে রাস উৎসব হত— মেলা বসত। মন্দির থেকে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ও রাধিকা মূর্তিকে এনে সাজানো হত। এই স্থানকে লোকে বলত রাসতলা। এখানে একটি কদম গাছ ছিল। তাই কদমতলাও বলত লোকে।

বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন একথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অকৃতদার শিক্ষাব্রতী খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এক মহৎ মনের মানুষ ছিলেন যাঁর জীবনের ধ্যানধারণা সাধারণ সাংসারিক লোকের মতো শুধুমাত্র নিজ পরিবারের সুখ-সুবিধার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। সেকালে নৈহাটিও তার আশপাশের অঞ্চলে তিনি আদরণীয় ছিলেন। ১৯২৫ সালে হুগলিতে সস্ত্রীক বাস করার সময় নজরুল যখন কবি খগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে আসতেন তখন পাশেই শ্যামাসুন্দরী দেবী মন্দিরে দেবীদর্শন ও প্রমাণ করতেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অনুরোধে শ্যামাসুন্দরীতলায় বসে নিজের লেখা শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

গরিফা রায়পাড়া রোডের এই বাড়িতে নজরুল গ্রামের মহিলাদের দ্বারা চরকায় সুতোকাটা দেখেন।

খগেন্দ্রনাথ নৈহাটি মহেন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ছাত্রদের বাংলা পড়াতেন ও তাদের হৃদয় হরণ করতেন ভলাবাসার সঙ্গে নানান হার্দিক সাহায্য দিয়ে। উল্লেখ্য যে কবি নজরুল ও খগেন্দ্রনাথ একই বছরে (১৮৯৯) জন্মেছিলেন— নজরুল মে মাসে আর খগেন্দ্রনাথ জুন মাসে। উভয়ের কবিসত্ত্বার অতিরিক্ত দু'জনেরই উদার মধুর স্নিগ্ধ ব্যক্তিসত্ত্বা তাঁদের বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ করেছিল।

খগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রথম জীবনে একান্তেই কাব্যচর্চা করতেন এবং এ ব্যাপারে নিজেকে বহুদিন প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। হয়তো নিজের সৃষ্টির প্রতি ছিল তাঁর সঙ্কোচ। তাই ১৯২৫ সালে তাঁর সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব হল এবং ক্রমে তা ঘনিষ্টতার রূপ নিলেও তাঁব কবি সত্ত্বার প্রকৃত পরিচয় নজরুল পেয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, অক্ষয় তৃতীয়া) খগেন্দ্রনাথের প্রথম এবং একমাত্র প্রকাশিত বৃহদাকার কবিতার বই 'চিত্রলেখা' প্রকাশের সময়। তিনি যে কিরূপ উচ্চ মার্গের কবিগুণান্বিত ছিলেন সে পরিচয় কবি নজরুল 'চিত্রলেখা'-র পরিচায়িকা-তেই আমাদের দ্বিধাহীন ও সার্থকভাবে জানিয়েছেন। তাঁর ঐ লেখা প্রতীয়মান করে যে খগেন্দ্রনাথের কবিকৃতি সামান্য নয়। চিত্রলেখার 'পরিচায়িকা' হিসাবে কবি নজরুল লিখেছেন—

"আমার কবিবন্ধু খগেনবাবুর সঙ্গে বহুদিন আগে যেদিন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় রসগ্রাহী সুন্দরের রূপ তৃষ্ণাতুর তরুণ রূপে, সেদিন তাঁর হৃদয় ভূমিতে দেখেছিলাম রসের তরঙ্গ— পুষ্প-পল্লবের সমারোহ দেখিনি। তার পরেও বহু বৎসর ধরে আলাপ পরিচয়ের মাঝেও জানতে পারিনি তাঁর সেই বিজন বনভূমিতে কুমারী বনলক্ষ্মীর মধুর আবির্ভাবের বার্তা। ...বিরহের মহাসিন্ধুর তীরে প্রিয়হারা একা কবি যে গান গাইলেন তাতে সমুদ্রে উঠলো জনকল্লোল, বাতাসে জাগল ঝঞ্ঝার হিল্লোল, জ্যোৎস্নার আঁচল ছড়িয়ে পূর্ণিমা বিভাবরী উঠল কেঁদে।

সে কি ভাষা, সে কি উপমা। সত্যকার ভাল না বাসলে, প্রেমের তপস্বী না হলে, এ বাণী,

এভাবে ব্যাকুলতা লেখনী মুখে আসেনা। স্বতঃউৎসারিত ঝর্ণাধারার মত স্বচ্ছন্দ সতেজ এই গতি আসতে পারেনা মহাবাণীর কৃপা ছাড়া।

তাঁর এই কবিতাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ট পরিচয়। বাংলার কাব্য গগনে এতদিনে এক নূতন জ্যোতিষ্কের উদয় হল। এই জ্যোতিষ্ককে আমার সঙ্গে সকলেই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করবেন সন্দেহ নাই।"

বাংলার সাহিত্যাকাশে নবোদিত এক কবির আলোকিত কাব্য-কৃতির উদ্দেশ্যে প্রশস্তি অন্য এক প্রতিভা-ভাস্বর মরমী কবি জ্যোতিষ্কের শুধুমাত্র বন্ধুর প্রতি স্নেহজনিত অতিশয়োক্তি ছিল না, বাস্তবিক এ ছিল এক কাব্যরসিক মহাপ্রাণের অন্যের কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ন কষ্টিপাথরে যা খাঁটি সোনা রূপেই ধরা পড়েছে।

পরবর্তীকালে সম্ভবত ১৯৪০-৪১ সালে কবি নজরুল আরও একবার নৈহাটিতে এসেছিলেন। সেবার তাঁকে নিয়ে আসেন তাঁর প্রীতিভাজন শিষ্য প্রতিম সঙ্গীত শিল্পী মৃণাল কান্তি ঘোষ। 'দুলটি' এই নামে তিনি নৈহাটি ও আশেপাশের অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। আরও একজন ও ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর নাম অবন্তী সেন। তিনি মৃণালকান্তির শ্রদ্ধাভাজন ও গুরুস্থানীয় ছিলেন।

মৃণালকান্তি ঘোষের বাড়ি ছিল নৈহাটির জান মহম্মদ ঘাট রোডে, যদিও ঐ সময় তিনি কলকাতায় থাকতেন। 'আনন্দমঠ' নাটকে 'বন্দেমাতরম্' গান ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' সিনেমার গানগুলি গেয়ে তখন তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাছাড়া ভক্তিগীতির মন কাড়া গাইয়ে রূপে তাঁর নাম তখন শহরে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়েছে। তাঁর গাওয়া নজরুল গীতি 'বলরে জবা বল' 'মহাকালের কোলে এসে' গান দুটি লোকের মুখে মুখে ফিরত। কবি নজরুল গানগুলি সুরারোপ করে তাঁকে শিখিয়েছিলেন। কবি তখন এইচ.এম.ভি গ্রামাফোন কোম্পানির মিউজিক ডিরেক্টর।

মৃণালকান্তি কবি নজরুলের খুবই প্রিয় ছিলেন। তিনি নিজেও নজরুলের গানে সুরারোপ করে গান গেয়েছেন। সেই গানটি হল— "আমার অহংকারের মূল কেটে দে।"

জান মহম্মদ ঘাট রোডে নৈহাটির প্রসিদ্ধ 'মহাকালীতলা'। মহাকালীতলায় 'ভ্রাতৃসমাজ' নামে এক ক্লাব আছে। সে সময় ভ্রাতৃসমাজ ক্লাব বাৎসরিক কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। নৈহাটির এপার ও গঙ্গার ওপার চুঁচুড়া-হুগলি থেকে নানা দল প্রতিযোগিতার অংশ নিত। ভ্রাতৃ-সমাজের তত্ত্বাবধানে একটি আপেরাদল ছিল। মৃণালকান্তি ভ্রাতৃসমাজের একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন। ঐ বছর কবি নজরুলকে কবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রধান অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করে নজরুলকে নিয়ে আসেন মৃণালকান্তি ঘোষ। কবিকে প্রথমে মৃণালাকন্তির গৃহে আনা হয়। তাঁর আগমন উপলক্ষে আশ-পাশের ইস্কুলগুলি ছুটি হয়ে যায়। তারপর কবি মহাকালীতলার দেবী মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত স্থানে কবাডি খেলা দেখেন। তাঁকে বসানো হয়েছিল রাস্তার বাঁ-পাশের এক উঁচু বেদির মত জায়গায়। সুদেহী দীর্ঘকায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আয়ত চোখ কবির আদুর গায়ে ছিল একটি সিল্কের উত্তরীয় ও পরণে সিল্কের ধুতি। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল।

সে বছর ফাইনাল খেলায় দুটি দলের মধ্যে একটি দল ছিল হুগলি অঞ্চলের, তাঁরা হিন্দু দল এবং অন্য দলটি ছিল নৈহাটির পূর্বাঞ্চলের তারা মুসলিম দল। খেলা চলাকালীন হিন্দু ও মুসলমান উভয়দলের খেলোয়াড়দের কেউ কেউ দৃষ্টিকটুভাবে মাথাগরম করে ফেলেছিল।

কবি তাঁর ভাষণে সে কথার উল্লেখ করে বলেন—

"একই আকাশের বুকে যেমন চন্দ্র ও সূর্য শোভা পাচ্ছে তেমনি এই বাংলা মায়ের বুকে একই সঙ্গে রয়েছে হিন্দু-মুসলমান। তারা কি পরস্পর ভাই নয়? তাদের দেহের রক্তের বর্ণ একই— লাল। তারা একই বাতাসে শ্বাসগ্রহণ করে, একই চালের ভাত খায়। তবে কেন প্রেম ভালবাসার বাঁধনে তারা পরস্পর বাঁধা থাকবে না? কেন হিংসার বিষে জর্জরিত হবে? এর দ্বারা যে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা হচ্ছে আর মজা দেখছে তারা, যারা আমাদের ভৃত্য করে রাখতে চায়— এই ইংরাজ শাসকরা।

তাই আত্মীয় বিরোধভুলে আজ আমাদের এক হতে হবে— মানুষের অধিকারের জন্য লড়তে হবে। ভাই ভাই-এর মধ্যে খেলায় মারামারি কেন— রেষারেষি কেন? তোমরা প্রেমবদ্ধ হও। খেলার তো হার জিৎ একটা আছেই— কিন্তু তোমরা কেউ নিজেদের কাছে হেরো না। একই ভগবানের তোমরা সন্তান, একই মায়ের কোলে তোমরা বাড়ছ। একতাই আমাদের বল।"

সভা শেষে দর্শক ও খেলোয়াড়রা চলে গেলে কবিকে দেবী মন্দিরের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। মহাকালের কোলে এসে গৌরীর মহাকালীর মৃন্ময়ী মূর্তি দেখে তিনি মাকে প্রণাম করেন।

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট লেখক। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক*

বেলঘরে নজরুল ইসলাম

বিশ্বনাথ মুখার্জি

পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দিরকে কেন্দ্র করে বেলঘরেব জনপদ (বর্তমান বেলঘরিয়া)। গঙ্গানদী থেকে বেশ দূরে হওয়ায় বসতি গড়ার অসুবিধা ছিল অনেক। তবে রেলপথ হওয়ার পর শুরু হল অন্য পথে হাঁটা। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা, ডিরোজিওর আবির্ভাব, রামমোহনের নতুন দর্শনের প্রচার, আর ঠিক সেই সময়েই বিদ্যাসাগরের কলকাতায় আগমন। শুরু হল বাঙালির নবজাগরণ। পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজজীবন হাতছানি দিল। সেই উতোল হাওয়া এসে পৌঁছাল বেলঘরেও। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই উইলিয়াম কেরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বেলঘরের মানুষ হতোদ্যম হননি। কিছু পরেই প্রতিষ্ঠা হয় মিড্‌ল ইংলিস স্কুল, পাঠাগার, বালিকা বিদ্যালয়। শিক্ষার আলো গ্রামে আনল নতুন দিশা।

বেলঘরের সেই সময়ে সাহিত্য চর্চার জন্য সুনাম ছিল। নাটক লেখা হত, গান, কবিতা লেখা হত, হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করা হত। এই সবের ঋত্বিক ছিলেন কবি চণ্ডীচরণ মিত্র। এঁনারই সখ্যতার সূত্রে নজরুল ইসলামের বেলঘরিয়ায় আগমন। চণ্ডীচরণ মূলত ছিলেন কবি। তিনি গান লিখতেন, সুরও দিতেন।

নজরুলের সঙ্গে চণ্ডীচরণের ঠিক কবে কোথায় কিভাবে আলাপ হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে মনে হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে জাতির পক্ষ থেকে এলবার্ট হলে নজরুলকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তার কিছু আগে অনুষ্ঠিত বেলঘরের 'কবি সম্মেলনে' তিনি প্রথম এখানে আসেন। কবি সম্মেলনের স্থান ছিল কামারহাটি পৌরসভার সেই সময়ের উপ-পৌরপ্রধান বৈদ্যনাথ ঘোষালের সদ্য নির্মিত আবাসের বৈঠকখানা ঘরে। ঘরটি সুবিশাল ছিল। অনেকটা হলঘরের মত। এখনও আছে। তবে আকারে পরিবর্তন ঘটেছে। পাশের বারান্দা থেকে ঠাকুরদালান দেখা যেত। অপূর্ব সুন্দর এক অনুভূতি জাগত। বর্তমানে বাড়িটি ভগ্নদশাগ্রস্ত। বৈদ্যনাথ ঘোষালের ৯০ অতিক্রান্ত কনিষ্ঠ পুত্র তাঁর স্মৃতির ঝুলি ঝেড়ে অনেক কিছু শোনালেন। বললেন— এই কবি সম্মেলন হয়েছিল কবি চণ্ডীচরণ মিত্র ও অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর উদ্যোগে। সভাপতি বিখ্যাত জলধর সেন। নজরুল তো এসেছিলেনই আর এসেছিলেন কল্লোল গোষ্ঠীর প্রায় সবাই। শৈলজানন্দ মুখার্জি, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নরেন দেব, কালিদাস রায়, গোলাম মুস্তাফা, দিনেশ দাশ। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আসার কথা ছিল। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি আসতে পারেননি। অবশ্য একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সম্মেলনের শুরুতেই সেই চিঠি পড়ে শুনিয়েছিলেন অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী। সম্মেলনে নজরুলের কবিতা পাঠ করা হয়েছিল। গানও গেয়েছিলেন বেশ কয়েকটা। কিন্তু কোন গান গেয়েছিলেন তা কিছুতেই মনে করতে পারেননি প্রায় ৯৮ বছর অতিক্রান্ত বেলঘরের বিশিষ্ট

মানুষ শিবপ্রসন্ন ঘোষাল (সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন)। তবে তিনি নজরুলের বেলঘরে আসা সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। নজরুল এখানে মাঝে মধ্যেই আসতেন। বেলঘরিয়া এম ই স্কুলে (বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়) পিকনিক হত। অবশ্যই চণ্ডীচরণ মিত্রের উদ্যোগে। শিবপ্রসন্ন তখন নব্যযুবক। স্বাভাবিকভাবেই সব কাজের দায়িত্ব থাকত তার। এই পিকনিকে নজরুল এসেছিলেন।

'রসচক্র' নামে সাহিত্যের আসর বসত বৈদ্যনাথ ঘোষালের সেই বৈঠকখানা ঘরে। নজরুল সেখানে আসতেন। গান গাইতেন। কবিতা পাঠ হত। এই সাহিত্য সভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই অঞ্চলের সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষের মিলন সভা। আর নিঃসন্দেহে এই গ্রামের সঙ্গে নজরুলের একটা নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

বৈদ্যনাথ ঘোষালের এই বাড়িতে (বেলঘরিয়া) নজরুল এসেছিলেন। ছবিঃ রঘুনন্দন দে।

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট লেখক*

কাঁচড়াপাড়ায় নজরুল

তমাল সাহা

নজরুল এসেছিলেন কাঁচড়াপাড়ায় ১৯৪০ সালে। রেলওয়ে ওয়েলফেয়ার উইক। ব্রতচারী পার্ক, হাইন্ডমার্স ময়দান, বিটিসির মাঠ, হাইন্ডমার্স মঞ্চ জুড়ে নাচ-গান-নাটক-স্পোর্টস-যাত্রা-আবৃত্তির সে এক বিস্তৃত আয়োজন। সে অনুষ্ঠানে নজরুল এল ধ্রুপদী সঙ্গীত ও আবৃত্তির বিচারক হয়ে। তার হাত থেকেই খেয়াল গানে প্রথম স্থান বিজয়ীর পদক তুলে নেন নীহার মুখোপাধ্যায়। 'বিদ্রোহী'— আবৃত্তিতে প্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং ডালিম বিশ্বাস তার হাত থেকেই পেয়ে যান বিজয়ীর মেডেল। হাইন্ডমার্স ইনস্টিটিউটের দেয়ালে কান পাতলে আজও শোনা যাবে সেই উৎসবমুখর রাত্রির কলরব।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুর বাড়ির পাড়া— চৌধুরিপাড়া। সেখানেই থাকতেন সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। চুরাশির চৌকাঠে পা রেখেছেন। স্মৃতি আগলে বসে আছেন একাকী নির্জনে। সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাজ করতেন ক্যালকাটা টেলিফোনসে, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। এক সময় খেলতেন সেন্টার ফরোয়ার্ডে। প্রথমে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং পরে ইস্টবেঙ্গলে। নাটকও করতে পারতেন। পরবর্তীতে অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয় এবং হালিসহর গুডউইল ফ্রেটারনিটির সম্পাদকও হয়েছিলেন।

সেদিনকার নজরুল সম্বন্ধে কিছু...। —ও নজরুল! অমন সৌম্য চেহারা, চোখের গভীরতা দেখে তো আমি অভিভূত। তার হাত থেকে পদক নিলাম। সে এক অন্য অনুভূতি।

পবনতলা। খেলা মাঠের পাশে রোদ মাখছে বাড়িটা। সামনে ফুলের বাগান। এই সেই 'বিদ্রোহী' আবৃত্তির দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর বাড়ি। ডালিম বিশ্বাস দোতলায় শুয়ে আছেন। কাজ করতেন ৭নং লোকোশপে। শেষমেশ লোকোশপ ইন্‌সপেক্টর হয়ে অবসর নেন।

—নজরুলকে মনে পড়ে?

—মনে পড়ে না আবার! হাত থেকে মেডেল নিয়েছি। তিনি পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন। মুখস্থটা আরও ভাল করতে হবে। আসলে আবৃত্তির সময় আমার স্মৃতি একটু বেয়াদপি করেছিল।

—আর কিছু মনে পড়ে?

—একসঙ্গে ছবি তুলেছি, দেখবে? একটা সত্যি কথা বলব। এখন আফশোস হয়। তখন বুঝতেই পারিনি তিনি এতা বড় মাপের মানুষ। সৌভাগ্যই বলব, তার সঙ্গে অন্তত একটা ছবি আছে আমার।

কুমারহট্ট। দোলতলা। সেখানে থেকে একটু দূরেই নীহার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। পাঁচ পুরুষ আগের ভিটে। বাইরের ঘরে বসলুম। দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমে পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, যিনি নিধিবাবুর টপ্পা ও রামপ্রসাদী সঙ্গীতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

হালিসহরের সেই কিংবদন্তী সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্মেলনে তিনি সভাপতিও হয়েছিলেন। নীহারবাবু জানান, ১৯০১ সালে এইচ.এম.ভি-তে রেকর্ড করেন পুলিনবাবু। এই পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ই নজরুলকে নিয়ে এসেছিলেন কাঁচড়াপাড়ায়। তখন তারা থাকতেন বাবুব্লকে পুরনো বাসন্তীতলার বেলগাছওলা ২৭৯নং রেল কোয়ার্টারে। আর সেই পুলিনবাবুর ছেলেই হলেন নীহার মুখোপাধ্যায় যিনি খেয়ালে প্রথম হয়েছিলেন। নীহার মুখোপাধ্যায় আশি বছর পেরিয়ে এসেছেন। ৩৪নং ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্রেন্টিস ছিলেন তিনি।

—নজরুল সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

—সে তো অনেকদিনের কথা। বাবা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি একরাত ছিলেন। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে খুব তারিফও করেছিলেন।

—আমাদের গ্রুপে যতদূর মনে পড়ে ৮০ জন প্রতিযোগী। ছিল দিব্যি মনে আছে সেই খেয়াল। সঙ্গত করেছিলেন রামসীতা গলিব কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। আমার মেডেলটা দেখবে?

—দেখব তো বটেই। নজরুল সম্বন্ধে আর কিছু মনে আছে?

—নজরুল আমাদের সেই বাড়িতে একটা গানও গেয়েছিলেন— ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে।

তুমি এসেছিলে কাঁচড়াপাড়ায় যেন চারণ হয়ে। লুঙ্গির ঢংয়ে পোশাক তোমার পরণে। গায়ে পাঞ্জাবি। তার ওপর চাপকান, মাথায় খদ্দরের টুপি। ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে সেই সময়ে। না হলে কি আর কোনদিন তোমার উদাত্ত কবিকণ্ঠ শুনতে পেত কাঁচড়াপাড়া? কেননা মাঝের একটি বছর বাদ দিয়েই সেই অপয়া ১৯৪২-এর জুলাই কত তাড়াতাড়ি ছুটে এল। সেদিন অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর কলকাতা স্টেশনে গল্প বলতে গিয়েই তুমি হয়ে গিয়েছিলে চিরকালের বাকহারা।

কাঁচড়াপাড়ায় নজরুল এই রেল কোয়ার্টারে ছিলেন। ছবিঃ অনুপ ঘোষ

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট লেখক

কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮৯৯ : ২৪ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ। পিতা- কাজী ফকির আহমদ, মাতা- জাহেদা খাতুন।

১৯০৮ : ২০ মার্চ নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯১০ : আর্থিক অভাবে শিক্ষা বিঘ্নিত। মসজিদের ইমামতি মাজারের খাদেমগিরি ইত্যাদি কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ।

১৯১১-১২ : শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে প্রথমবার ভর্তি ও ঐ স্কুল ত্যাগ। লেটোর দলে যোগদান।
মাথরুন নবীন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি। দুই বছর অধ্যয়ন।
কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে শিক্ষকরূপে লাভ।

১৯১৩ : গার্ড সাহেবের বাড়িতে চাকরি।
পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিচয় এবং তার স্নেহানুকুল্য লাভ।

১৯১৪ : ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালথানার অন্তর্গত দরিরামপুর হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়ন। বার্ষিক পরীক্ষার পর দরিরামপুর ত্যাগ। (মতান্তর ১৯১৫ সালের মধ্যভাগে দরিরামপুর ত্যাগ।)

১৯১৭ : ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৯ : লেখকরূপে নজরুলের আত্মপ্রকাশ।
এই বছরে প্রথম প্রকাশ 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক 'সওগাত'-এ প্রকাশ।
এই বছরে নজরুলের কবিতার প্রথম প্রকাশ। কবিতার নাম 'মুক্তি'। (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ (১৩২৬) সংখ্যা।) নজরুল তখনও করাচী সৈন্যবিভাগে কার্যরত।

১৯২০ : করাচী থেকে কলকাতায় আগমন।
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে বসবাস শুরু।
এপ্রিল (বৈশাখ ১৩২৭) থেকে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু।
জুলাই থেকে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে 'সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনা।

ডিসেম্বর মাসে দেওঘরে গমন।

১৯২১ : আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের কুমিল্লা গমন। সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে প্রণয়। বিবাহর আয়োজন ১৮ জুন; ৩ আষাঢ়, ১৩২৮। সৈয়দা খাতুনের নজরুলের দেওয়া নাম নার্গিস।
নার্গিস পরিবারের সঙ্গে কোনও বিষয়ে নজরুলের বিরোধ এবং ৪ আষাঢ় ভোরে নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ।

১৯২১ : অক্টোবর মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গমন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'বিদ্রোহী' রচনা।

১৯২২ : ৬ জানুয়ারি সংখ্যা 'সাপ্তাহিক বিজলী'তে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রকাশ।
মার্চ মাসে নজরুলের প্রথমগ্রন্থ 'ব্যথার দান' গল্প সংকলন প্রকাশ।
২৬ সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'তে কবির 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং ১৩ অক্টোবর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রকাশ।
২৫ অক্টোবর 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।
৮ই নভেম্বর রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতাবী পরোয়ানা জারি।
২৩ নভেম্বর কুমিল্লায় নজরুল গ্রেফতার।

১৯২৩ : ৭ জানুয়ারি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' রচনা।
১৬ জানুয়ারি নজরুল ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।
২২ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতিনাট্য 'বসন্ত' নজরুলের নামে উৎসর্গ করন।
এপ্রিলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর জেলকর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে নজরুলের অনশন। ৩৯ দিন পর অনশন ভঙ্গ। ৭ মে শরৎচন্দ্র কবির সঙ্গে জেলে দেখা করতে যান। ডিসেম্বরে নজরুলের মুক্তিলাভ।
'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯২৪ : ২৫ এপ্রিল শুক্রবার আশালতা সেনগুপ্তের (প্রমীলা সেনগুপ্ত) সঙ্গে কলকাতায় হাজী লেনে নজরুলের বিবাহ এবং হুগলিতে ঘর-সংসার শুরু। প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকিকা উৎসব। কিছুদিন পরই এই সন্তানের মৃত্যু।
'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান'-এর প্রকাশ ও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৯২৫ : মে ফরিদপুরে কংগ্রেসে গান্ধীজির সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ।
১৬ জুন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে 'অর্ঘ্য', 'ইন্দ্রপতন' প্রভৃতি কবিতা রচনা।
'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১০ নভেম্বর The Labour Swraj Party of the Indian National Congress গঠিত। ঐ পার্টির ইস্তেহার নজরুল কর্তৃক ঘোষিত ও প্রকাশিত। ১৬ ডিসেম্বর 'লাঙল' প্রথম সংখ্যা সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ সহ প্রকাশ। (ঐ বছর ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত 'লাঙল' চলে।)

১৯২৬ : কৃষ্ণনগর-এ বসবাস শুরু।
১৯২৬-এর কেন্দ্রীয় সভার নির্বাচনে নজরুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয়।
সেপ্টেম্বরে কবিপুত্র বুলবুল (অরিন্দম খাদেল)-এর জন্ম।
'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯২৭ : ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অধিবেশনে নজরুলের যোগদান ও ভাষণ প্রদান।
জুলাই মাসে 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।
এই বছরে আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক নজরুলকে 'যুগ প্রবর্তক' কবি অভিধায় অভিহিত করন।

১৯২৮ : 'সওগাত' পত্রিকায় ইব্রাহীম খাঁ-র পত্রের উত্তরে নজরুলের বক্তব্য প্রকাশ। (পৌষ ১৩৩৪)
'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। অক্টোবরে 'সঞ্চিতা' প্রকাশিত হয়।
মুসলিম সাহিত্যে সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান।
মিস্ ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় ও অনুরাগ সঞ্চয়।
শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনা উপলক্ষে নজরুলের গান রচনা।
সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ 'নজরুলিস্তান' কলমের প্রবর্তন।

১৯২৯ : ১৫ ডিসেম্বর (২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬) জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৩০ : ৭ অথবা ৮ মে (বৈশাখ, ১৩৩৭) নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।
'প্রলয়শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' প্রকাশ—ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৯৩১ : নজরুল ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের সুরভাণ্ডারী নিযুক্ত হন।
জুন মাসে নজরুলের দার্জিলিং ভ্রমণ। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১৯ ডিসেম্বর কলকাতার রঙ্গমঞ্চে নজরুলের 'আলেয়া' প্রদর্শিত।

১৯৩২ : অগস্টে স্বদেশি মেগাফোন কোম্পানিতে নজরুলের যোগদান।

১৯৩৩ : ৩ ডিসেম্বর 'ধ্রুব' ছায়াচিত্রের জন্য গান রচনা। ঐ চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়।

১৯৩৪ : ১ জানুয়ারি 'ধ্রুব' ছায়াছবির মুক্তি।

১৯৩৬ : ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে নজরুলের সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ দান।

১৯৩৭ : (১০ জানুয়ারি) কলকাতার ওয়াছেন মোল্লা ম্যানসনের ঈদপ্রীতি সম্মেলনে

নজরুলের ভাষণ 'সাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখার সভাপতিত্ব।
কবির সহধর্মিনী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত।
২১ জুন 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। গান নজরুলের।
'বিদ্যাপতি' ছায়াচিত্রের কাহিনী ও গান রচনা।

১৯৩৮ : দৈনিক কৃষক পত্রিকার কার্যালয়ে নজরুল কর্তৃক জন সাহিত্য সংসদের উদ্বোধন ও ভাষণ।

১৯৩৯ : 'সাপুড়ে' ছায়াচিত্রের কাহিনি ও গান রচনা।

১৯৪০ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির ঈদপ্রীতি সম্মেলনে নজরুলের অভিভাষণ।
১২ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে নজরুলের যোগদান।

১৯৪১ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (৫ ও ৬ এপ্রিল) রজত জয়ন্তীর সভাপতি রূপে ভাষণ দান।
২৫ মে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে কলকাতায় মহাসমারোহে নজরুল জন্মদিবস উদ্‌যাপিত।
৭ আগস্টে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরপরই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রবিহারা' নামে কবিতা আবৃত্তি।
অক্টোবরে দৈনিক 'নবযুগ' (নব পর্যায়)-এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৪২ : নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৪৩ : 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠিত। সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৫ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিনী স্বর্ণপদক প্রদান।

১৯৫২ : (জুলাই) নজরুল নিরাময় সমিতি কর্তৃক কবি সস্ত্রীক রাঁচির মানসিক হাসপাতালে প্রেরিত। চার মাস চিকিৎসার পর পরিবর্তিত অবস্থায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৩ : নিরাময় সমিতি কর্তৃক চিকিৎসার জন্য কবি লন্ডনে ও ভিয়েনায় প্রেরিত (১০ মে)।
১৫ ডিসেম্বর, নিরাময় না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৬০ : 'ধূমকেতু' (প্রবন্ধ গ্রন্থ), 'ঝড়', 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'এর প্রকাশ। কবিকে 'পদ্মভূষণ' উপাদি প্রদান।

১৯৬২ : ৩০ জুন কবি-পত্নী প্রমীলার মৃত্যু (চারুলিয়ায় সমাধিস্থ)।

১৯৬২ : কবি পুত্রবধু উমাকাজী সহ বাংলাদেশ গমন (২৪ মে)।

১৯৬৪ : 'ঘুম জাগানো পাখি' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৬৫ : 'ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৬৬ : 'রাঙা জবা' সঙ্গীতগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৬৮ : 'দেবীস্তুতি'র প্রকাশ

১৯৭০ : 'সন্ধ্যামালতী'র প্রকাশ

১৯৭৪ : ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক নজরুলকে ডি-লিট উপাধি প্রদান।

১৯৭৬ : ২৯ অগস্ট (১৫ ভাদ্র, ১৩৮৩) রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি লোকান্তরিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে সমাধিস্থ করা হয়।

—সংকলন : বসুমিত্র মজুমদার

সৌজন্য: 'দিশা', সম্পাদনা- সমীর চক্রবর্তী
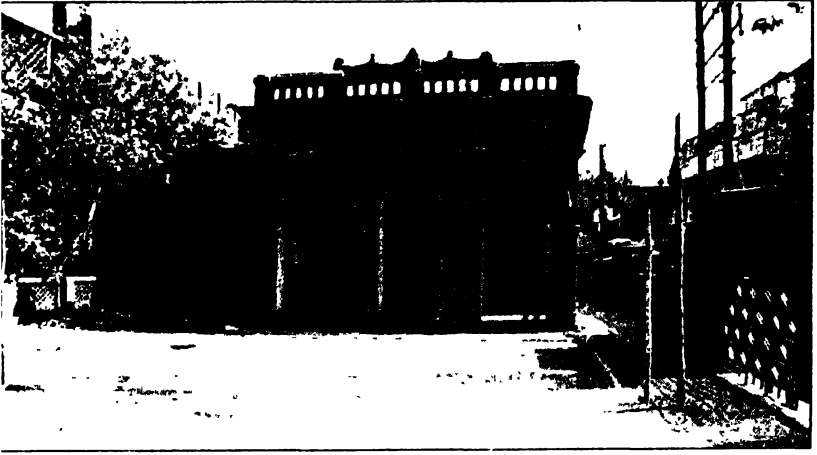
মহাকালিতলা নৈহাটি, নজরুল এখানে কবাডি খেলা দেখেছিলেন।

নৈহাটি খগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে নজরুল এসেছিলেন।

নৈহাটি শ্যামাসুন্দরী মন্দির। এখানে নজরুল স্বরচিত গান গেয়েছিলেন।
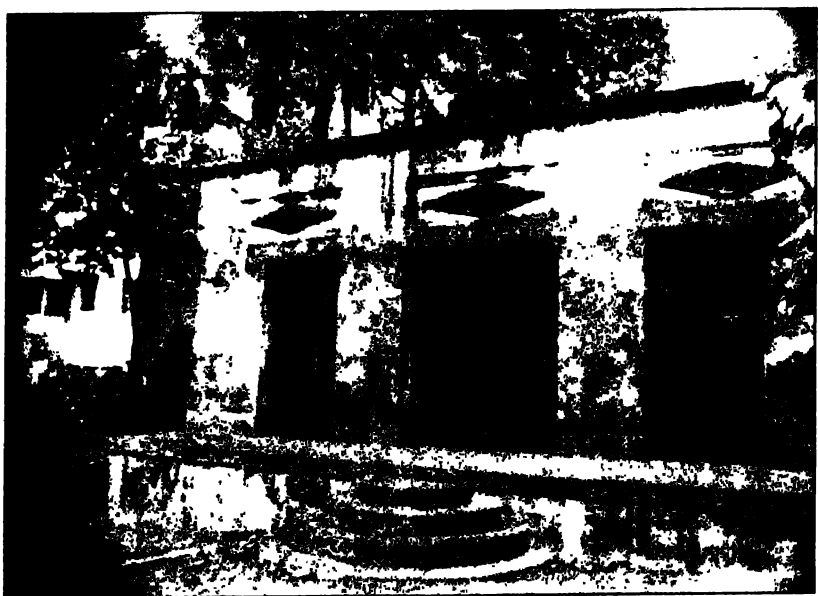
গরিফার মজুমদার বাড়ির এই বৈঠকখানায় নজরুল নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

ছবি: রঘুনন্দন দে

নজরুলের ভায়েরাভাই ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের আড়িয়াদহের বাড়ি। এখানে নজরুল বহুবার এসেছেন ও থেকেছেন। ছবি: রঘুনন্দন দে
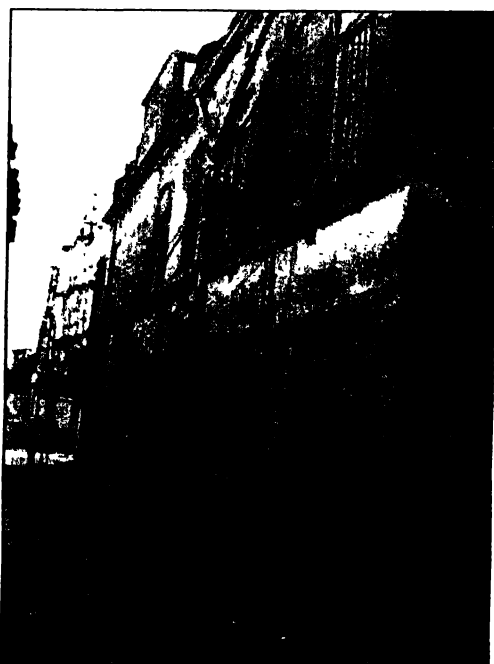
দক্ষিণেশ্বরে তৎকালীন ললিতমোহন দে-র বাড়িতে (২২, কেদারনাথ ব্যানার্জি রোড) ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্ত ভাড়া থাকার সময় নজরুল এখানে আসতেন এবং বাড়িটির দ্বিতলে থাকতেন।
ছবি: রঘুনন্দন দে

আড়িয়াদহে ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর কয়েকদিন পর এই বাড়িতে বসে নজরুল 'অকালসন্ধ্যা' নামে গানটি রচনা করেন। ছবি: রঘুনন্দন দে

কাঁচরাপাড়ায় নজরুল। ছবি: কেতন চট্টোপাধ্যায়, সংগ্রাহক : মণি ভট্টাচার্য

পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা সহ সুরেন্দ্রনাথ। শিল্পী : শ্রী রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়
সৌজন্য : বসুমতি প্রেস

সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সৌজন্য : বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়